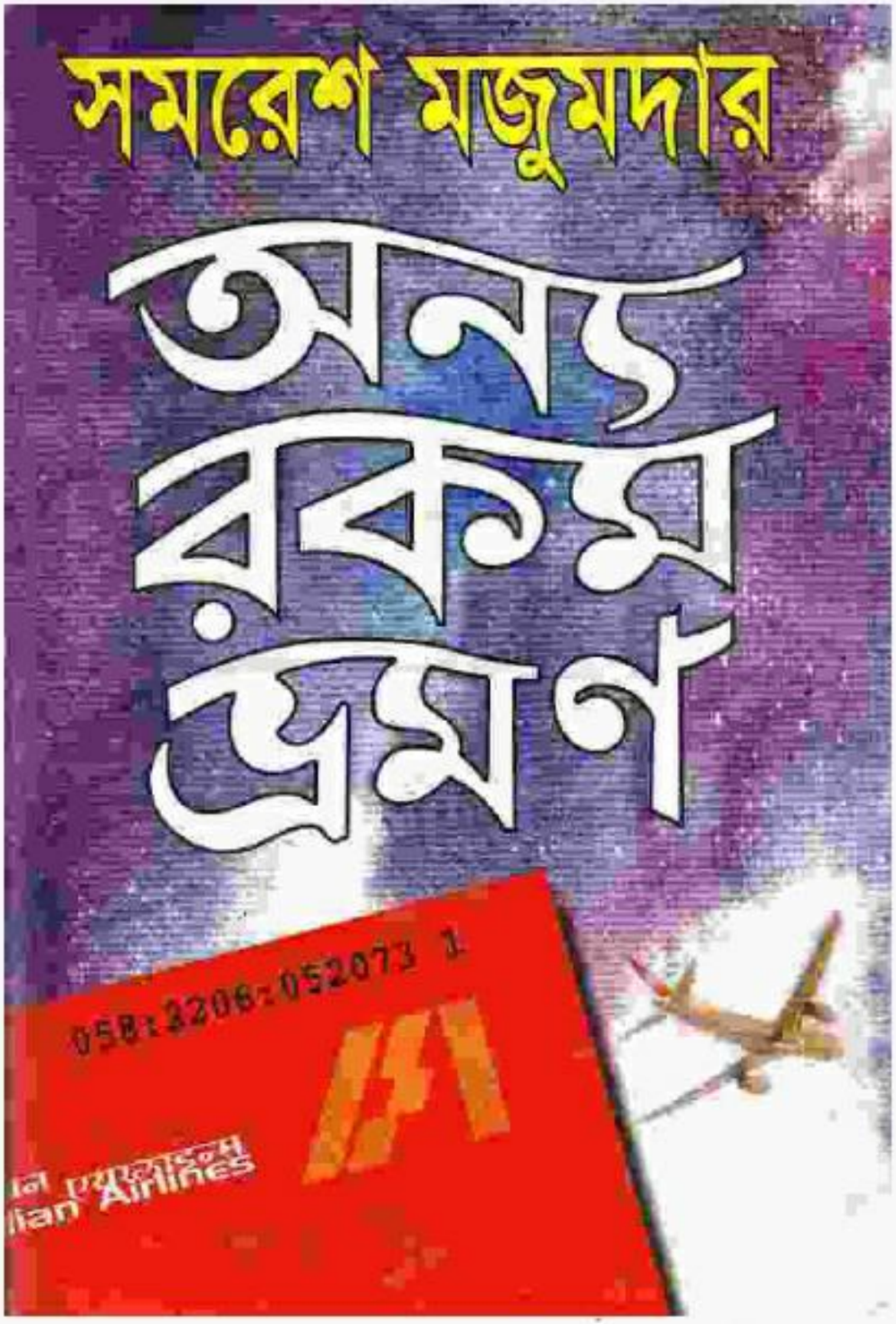

এই লেখার শুরুতে দুটি মানুষের কথা একটু আলাদা করে বলে নেওয়া দরকার। এঁরা দুজনেই বাংলাদেশের মানুষ, থাকেন নিউইয়র্কের ব্রুকলিন অঞ্চলে। একটু ভুল হল। দ্বিতীয় জন, যাঁর নাম সাহাবুদ্দিন, তিনি নিজেকে বাংলাদেশের মানুষ বলে মনে করেন না। তিনি দেশ ছেড়েছিলেন আটষট্টি সালে যখন দেশটার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। তাঁর পাশপোর্টে নাগরিক হিসেবে পাকিস্তানের নাগরিক লেখা ছিল। এই বত্রিশ বছরে তিনি ঢাকায় যাননি একবারও কিন্তু মীরপুরের আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। এখন তিনি আমেরিকান পাশপোর্ট-হোল্ডার। ব্রুকলিনের একটি অভিজাত বার-কাম-রেস্তোরাঁর মালিক।

প্রথমজনের নাম আব্দুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। চাকরির সন্ধানে জার্মানি গিয়েছিলেন একসময়। সেখান থেকে চলে এসেছিলেন মার্কিনমুলুকে। একটি সন্তানের পিতা আব্দুর এখন কোনও কাজকর্ম করেন না। কারণ ব্রুকলিনে দুটো বাড়ির মালিকানার কারণে ভাড়া আসে ভালই। স্ত্রীও পার্ট টাইম চাকরি করেন।

আব্দুর রহমানের বয়স এখন চল্লিশের সামান্য ওপরে। ফর্সা, ছোটোখাটো চেহারার মানুষটির মুখে সবসময় যে হাসিটি লেগে থাকে তাকে কষ্টার্জিত বলে ভাবার কোনও কারণ নেই। ওঁর পোশাকে কখনও অবহেলার ছাপ থাকে না। কথা বলেন, নিচু গলায়। সমস্ত ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। তবে টেনশনে ভোগেন। একটু ব্যতিক্রম কিছু ঘটলেই ওঁর টেনশন বেড়ে যায়। আব্দুরের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হল সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য। কয়েকবছর আগে এই ভদ্রলোক মার্কিনদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। অতএব তিনি বাংলাদেশী-আমেরিকান।

এই দুটি মানুষের কথা বলতে হল কারণ গেল বছর আমার বেড়াতে যাওয়ার প্রাথমিকপর্ব এদের সঙ্গেই কেটেছিল।

আটানব্বুইতে যখন প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমন্ত্রণে ওদেশে গিয়েছিলাম তখন আব্দুর রহমানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে তিনি আমাকে তাঁর লেখা একটি বই দিয়ে পড়তে অনুরোধ করেছিলেন। সে সময় ওঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। ওঁর বিনয়, সুব্যবহার, সাহিত্যপ্রীতি আমাকে কিছুটা মুগ্ধ করেছিল। তাই দেশে ফিরে আসার পরেও টেলিফোন চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। গেল বছর যখন ওদেশে গেলাম তখন আব্দুর রহমানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম এয়ারপোর্টে। ওঁর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। এতে আমার বেশ কিছু লাভ হল।

এর আগে যতবার মার্কিনদেশে গিয়েছি,—সেই প্রথমবার যখন আমি সরকারি আতিথি ছিলাম, সেবার ছাড়া বেশিরভাগ সময় থেকেছি কলকাতার কোন বাঙালিদের বাড়িতে। এঁদের প্রত্যেকের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, ইঞ্জিনিয়ার নয় ডাক্তার। শহরের বাইরে বর্ধিষ্ণু এলাকায় বিরাট বাগান এবং লনওয়ালা সুন্দর বাড়ির মালিক এঁরা। গ্যারাজে গোটা তিনেক গাড়ি, স্ত্রী বাঙালি রান্না চমৎকার রাঁধেন এবং বেশিরভাগের পুত্রকন্যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে না, অতিথি দেখলে এড়িয়ে যায়।

কিন্তু আসল সমস্যা হল, স্বামী-স্ত্রী যদি তাঁদের গাড়িতে তুলে শহরে বা কোন বাজারে নিয়ে যান তাহলেই বাড়ি থেকে বেরনো সম্ভব হয়। নয়তো বসে থাকতে হয় শনিবার রাতের জন্য। কোনও পার্টিতে গৃহকর্তা নিয়ে যাবেন আদর করে, সেখানে প্রায় একই মুখ দেখতে হবে, একই কথা শুনতে হবে। এই বন্দীদশার কারণ হল এইসব ছবির মত সুন্দর বাড়িগুলো এত নির্জনে যে হেঁটে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। একটু এগোলেই হাইওয়ে, সেখানে হাঁটার অনুমতি পুলিশ দেবে না। কাছেপিঠে রেস্টুরেন্ট বা দোকান খুঁজে পাওয়া মুশকিল। গাড়ি চালাতে না পারলে বন্দী হয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। আর ভারতবর্ষের

ড্রাইভিং লাইসেন্সের কোন মূল্য ওখানে নেই। এমনকি আন্তর্জাতিক লাইসেন্স হয়ে গেলেও আজকাল ওদেশের পুলিশ সন্তুষ্ট হচ্ছে না। অথচ ওদের গাড়িতে গিয়ার নেই, কলকাতায় ট্র্যাফিকে গীয়ার চেঞ্জ করে গাড়ি চালানো যদি হায়ারসেকেন্ডারির অঙ্ক হয় তো ওদেশের ড্রাইভিং ক্লাশ টু-এর।

এই অবস্থায় আব্দুর রহমানের বাড়ি মানে স্বর্গ পাওয়া। ওঁর বাগান নেই, কিছু গাছ আছে বাড়ির পেছনে। লন নেই, গ্যারাজে তিনটে দূরের কথা একটাও গাড়ি নেই। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুতেই ফুটপাত। দু'পা হাঁটলেই টিউব স্টেশনে নামবার সিঁড়ি। আর যতরকমের দোকানপাট সব চারপাশে থরে থরে সাজানো। শুধু ফুটপাত ধরে হেঁটে দোকানের শো-কেসগুলো দেখে সারাদিন দিব্যি কেটে যায়। কারও ওপর নির্ভর করা প্রয়োজন নেই, রাস্তায় চলা যায় স্বচ্ছন্দে। নিচে নেমে পাতাল রেলের টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসলে নিউইয়র্কটাকে চষে ফেলা যায়।

শহরের মধ্যে এরকম এলাকায় কলকাতার বাঙালিরা থাকেন না কেন? কেন, যখন তাঁরা প্রথম চাকরি করতে নিউইয়র্কে পৌঁছান তখন সস্তায় মার্কেট, যানবাহনের সুবিধে খোঁজেন। এইসব এলাকায় ফ্ল্যাট পেলে ধন্য হয়ে যান। কি যেই পায়ের তলায় মাটি এল, আগে-এসে-সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া দাদাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শহরের বাইরে লনওয়ালা বাড়ি কেনেন ধারের টাকায় যা প্রায় সারাজীবন ধরে শোধ করে যেতে হয়। কারণ ফ্ল্যাটে থাকলে স্ট্যাটাস বাড়ে না এইরকম ধারণা চালু আছে। তবে ফ্ল্যাটের ভাড়া বাড়ছে হু হু করে। দু-চারবছরে যারা ওখানে গিয়েছে তারা আর শহরের মধ্যে ফ্ল্যাট নিচ্ছে না ওই বেশি ভাড়ার জন্যে। নিউইয়র্ক থেকে ট্রেনে চেপে চলে যাচ্ছে এক দেড় ঘণ্টা দূরে। পাণ্ডববর্জিত সেসব জায়গায় গজিয়ে-ওঠা ফ্ল্যাটের ভাড়া খুব কম। ডেলি প্যাসেঞ্জারির কষ্ট সহ্য করে তারা ডলার বাঁচান। এটুকুই তাঁদের সান্ত্বনা।

আব্দুর রহমানের বাড়িতে এসে আমি খুব স্বস্তি পেলাম। ওঁর স্ত্রী খুব নরম মহিলা, বললেন, 'দাদা, আপনার বই পড়তে খুব ভাল লাগে। আব্দুরের মেয়ের বয়স বছর আঠারো। পড়ছে এবং চাকরি করছে। চমৎকার বাংলা বলে, এমন কি জীবনানন্দের কবিতাও। অথচ ইংরেজি বলার সময় ওদেশীয় উচ্চারণ করে সহজেই। সেই লস এঞ্জেলস থেকে টরেন্টো হয়ে নিউইয়র্ক পর্যন্ত ঘুরে আমি মাত্র একটি পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালির চৌদ্দ বছরের সন্তানকে পেয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের গোটা কবিতা চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে। কুইনসের নীতিশ-শর্মিলার ছেলেটি নেহাতই ব্যতিক্রম।

গতবার গিয়েছিলাম গরমের সময়। নিউইয়র্কে গরম পড়ে বেশ। তবে লস ভেগাসের মত অসহ্য গরম নয়। সেখানে রাত এগারোটাতেও রাস্তায় স্বস্তিতে হাঁটা যায় না। তবে হিউমিডিটি কম থাকা সত্তেও নিউইয়র্কের গরমে রাস্তায় হাঁটলে কপালে ঘাম জমে।

আব্দুর রহমান আমাকে যে ঘরটি দিয়েছিলেন সেটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। অভ্যেস না থাকায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে মেসিন বন্ধ করে জানলা খুলে দিয়েছিলাম। ফুরফুরে বাতাস বইছে মধ্যরাত্রে। আধখানা চাঁদ আকাশে। সুনসান রাস্তা। মাঝেমধ্যে একটা দুটো গাড়ি। আশেপাশের সব বাড়ির আলো নিভে গেছে। তবু ঘন অন্ধকার কোথাও নেই। জীবনানন্দের লাইনটাকে অন্যভাবে মনে এল, 'আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মত এই অন্ধকার'।

সকালে ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। তৈরি হয়ে ওদের খাওয়া এবং বসার বড় ঘরটায় এসে দেখি আব্দুর রহমান নেই। ওঁর স্ত্রী আমায় আপ্যায়ন করে যে চেয়ারটায় বসালেন তার সামনে টেবিলের পেছনে জানলা, জানলার ওপারে লতানো গাছ যা পেছনের বাগান থেকে উঠে এসেছে। রাত্রে ঘুমের অসুবিধে হয়েছে কিনা, আমি যদি কলকাতায় ফোন করতে চাই তাহলে নির্দ্বিধায় করতে পারি ইত্যাদি বলার পরে তিনি চা দিলেন।

এই টেলিফোন নিয়ে কত ঘটনা ঘটে যায়। যাঁরা কলকাতা থেকে ওখানে পৌঁছান তাঁদের প্রথমেই মনে হয়, এই যে ভালভাবে পৌঁছচ্ছে সেই খবরটা দেওয়া দরকার। যে বাড়িতে উঠছেন তার কর্তাকে মনের বাসনা জানালেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ লাইন ধরে দিলেন। কথা বলার সময় খেয়াল রাখতে হল ঘড়ির দিকে। আন্তর্জাতিক টেলিফোন, খরচটাও বেশি, কিন্তু গৃহস্বামীকে বলা যায় না টাকা নিতে। কিন্তু ওই বাড়িতে দিন দশেক থাকলে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করা খুব মুশকিল হয়ে যায়। কলকাতায় এসে কেউ যদি বাড়িতে উঠে বলে নিউইয়র্কে একটা ফোন করব তাহলে প্রথমবার অনুমতি দিতে অস্বস্তি হয় না কিন্তু দ্বিতীয়বারে মন তেতো হয়ে যায়।

বান্টিফোরের পি কে ঘোষ প্রতিবছর এরকম বহু বাঙালিকে আতিথ্য দেন এবং তাঁর টেলিফোনের বিল এত বড় হয়ে যায় যে তিনি কয়েকটা কার্ড কিনে রেখেছেন। অতিথিদের কেউ ফোন করতে চাইলেই দশ ডলারের কার্ড এগিয়ে দেন। ওই কার্ডের নাম্বার টিপলে অপারেটার দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন যতক্ষণ না দশ ডলার শেষ হয়। এতে গৃহস্বামীর টেলিফোন বিল বাড়বে না। যিনি কার্ড নিচ্ছেন তিনি কার্ডের দামটা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। পরের বার কার্ড চাইতে সঙ্কোচ করছেন না। তবে তাঁরও মনে হচ্ছে ভাল করে কথা বলার আগেই কার্ডের আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে।

প্রয়াত অভিনেতা শ্রদ্ধেয় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার একবার ওদেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। কার্ডটা হাতে নিয়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমি এটি দিয়ে দশবার ফোন করব।' নাম্বার ঘুরিয়ে অপারেটারকে কলকাতার নাম্বার বলে তিনি কান খাড়া করে থাকতেন। যেই চেনা গলা পেতেন বলতেন, 'ভাল আছি।' বলেই লাইন কেটে দিতেন। ওঁর হিসেব মত এইভাবে কথা বললে দশবার কেন, কুড়িবার কথা বলা যায়।

কিন্তু সপ্তমবারে অপারেটার জানাল, 'তোমার আর ষাট সেকেন্ড বাকি আছে।' খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন সত্যদা। তিনি ঘড়ি দেখে ফোন করছেন। ওঁর সঙ্গে অপারেটারের হিসেব মিলছে না। পরে শোনা গেল যে মুহূর্ত থেকে অপারেটার দেশের নাম্বার ঘোরাচ্ছে সেই মুহূর্ত থেকেই কার্ডের সময় কমে যাচ্ছে। সত্যদা হতাশ গলায় বলেছিলেন, 'এ দেখছি ভয়ানক গ্যাঁড়াকল।'

আব্দুর রহমানের স্ত্রী যে প্রস্তাব দিলেন সেটা তো হাতে স্বর্গ পাওয়ার মত। কিন্তু আমার তো এটা প্রথমবার নয়, বেশ কয়েকবার ওদেশে গিয়েছি বলে তাড়াহুড়া করে কলকাতায় খবর পাঠানোর ইচ্ছেটা তেমন জোরালো নেই। আমি

চা খাচ্ছিলাম। আব্দুর রহমানের স্ত্রী একগাল হেসে বললেন, 'আপনি যে চেয়ারটায় বসেছেন ওখানে বসেই ও লেখালেখি করে।'

আমি বললাম, 'তাই? তাহলে তো আমার এখানে বসা উচিত হয়নি।'

'একি কথা দাদা! আপনি বসেছেন বলে আমরা ধন্য। তবে অন্য কাউকে আমি ওই চেয়ারে বসতে দিই না।' আব্দুর রহমানের স্ত্রী বললেন, 'সারাটা সকাল ও ওই চেয়ারে বসে লেখে। যখন লেখা আটকে যায় তখন জানলার বাইরে হাত বাড়ায়।'

'জানলার বাইরে হাত বাড়ায় কেন?' আমি অবাক হয়ে দোতলার জানলার বাইরে তাকালাম। আকাশ তো পৃথিবীর সবদেশে একই রকমের।

'ভাল করে দ্যাখেন, ওই লতাটায় কি ঝুলছে।'

দেখলাম। থোকা থোকা আঙুর। দেখে মনে হল এখনও পাকেনি। বললাম, 'বাঃ! তোমাদের বাড়িতে আঙুর গাছ আছে দেখছি।'

'হ্যাঁ। হাত বাড়িয়ে একটা আঙুর ছিঁড়ে মুখে দেয়। কিছুক্ষণ পরে আবার লিখতে শুরু করে। মানুষটা খুব নরম। ওকে আমি কোন কাজ করতে দিই না। শুধু ও মনের সুখে লিখুক। একটা লেখা যখন শেষ করে তখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে যে কী আনন্দ হয় আমার—বোঝাতে পারব না আপনাকে।'

আমার খুব ভাল লাগল। নিউইয়র্ক শহরের মাঝখানে বসে একটি মানুষ বাংলা গল্প উপন্যাস লিখে যাচ্ছে আর তার স্ত্রী সে কারণে তাকে যত্ন করছে, এটা শুনলে আমার তো ভাল লাগবেই। হ্যাঁ, হতেই পারে, সেই লেখার মান তেমন উঁচুতে নয়, প্রকাশকরা উদ্যোগ নিয়ে ছাপতে আগ্রহী নন, আব্দুর রহমানের যে বইগুলো বেরিয়েছে সেগুলো হয়তো তাঁরই টাকায় ছাপা কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। লেখালেখির আগ্রহটা তাঁর আকাশছোঁয়া, সেটাই আসল কথা।

তবে ভালমানুষ আব্দুর রহমান আমাকে নিয়ে একটু মুশকিলে পড়লো, প্রথমত, আমি যেকদিন থাকব তিনি লেখালেখি করবেন না। আমার উপস্থিতিতে লেখালেখির কথা নাকি তিনি ভাবতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, বেলা বারোটায় খেয়ে দেয়ে আমি বের হই, তিনি সঙ্গে থাকেন। ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত হয়ে যায়। এটা তাঁর অভ্যেস নেই। মাঝে মাঝেই বাড়িতে টেলিফোন করে খবরাখবর নিয়ে শান্ত থাকতে হত তাঁকে। আমি অনেক অনুরোধ করেছি তাঁকে সঙ্গি না হতে কিন্তু তিনি রাজী হননি কারণ আমি হারিয়ে যেতে পারি।

এদিকে নিউইয়র্কের পাতাল রেল যে আমার কাছে দমদম-টালিগঞ্জ হয়ে গেছে তা ভদ্রলোককে বোঝাতে পারিনি।

খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে প্রথমে জ্যাকসন হাইটে বিশ্বজিতের দোকানে যেতাম। ওটা বাংলা বই আর সিডি ক্যাসেটের দোকান। চারপাশে ইংরেজির ভিড়ে একটি দ্বীপের মত, আমাদের কাছে। কিছুক্ষণ গল্প করে এলোমেলো হাঁটা। কখনও অফ ট্র্যাক বেটিং সেন্টারে গিয়ে ঘোড়ার ওপর দুবার ডলার বাজি ধরা, কখনও শামার সঙ্গে ওর নতুন বাড়ি যেটা নিতে যাচ্ছে, দেখতে যাওয়া। অথবা জ্যাকসন হাইট, ম্যানহ্যাটনের দোকানে রাস্তায় যেসব বাংলাদেশি ছেলেমেয়ে কাজ করছে অথবা কাজের জন্যে ঘুরছে তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে খবরাখবর নেওয়া ছিল আমার কাছে নেশার মত।

আব্দুর রহমানের এসব ঠিক পছন্দ হত না। বিশ্বজিত যে ওঁকে লেখক হিসেবে পাত্তা দিচ্ছে না, অথচ মুক্তধারাই ওই শহরের সেরা বইয়ের দোকান, এটা ওঁকে খুব দুঃখিত করত।

এর ওপর নেমন্তন্ন। যিনি নিউইয়র্কের রাস্তায় ট্যাক্সি চালান সেই সিলেটের বঙ্গসন্তান রাত্রে তাঁর বাসায় আমাকে খাওয়াতে চান। তাঁর অভিজ্ঞতা শোনার বাসনা আমাকে পেয়ে বসে। যে ভদ্রমহিলা বাংলাদেশের বিখ্যাত গায়িকা কিন্তু নিউইয়র্কে থাকেন ছেলেমেয়েদের জন্যে, তাঁর বাড়িতে মধ্যরাত পর্যন্ত যে জমাটি আড্ডা সেখানে আমার সঙ্গি হতে হয় আব্দুর রহমানকে। এসব তিনি করেছেন আমার জন্যে নয়, বাংলা সাহিত্যকে ভালবাসার কারণে, এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সাহাবুদ্দিনকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন আব্দুর রহমানই। আমার ওই উড়ুক্কু জীবনযাপন দেখে দেখে শেষ পর্যন্ত এক সন্ধেবেলায় বলে ফেললেন, 'চলেন দাদা, একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

আমার আপত্তি নেই। সেদিন আমরা বিকেল বিকেল বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম। আব্দুর রহমানের স্ত্রী খুশি হয়েছিলেন তাই, ভাল ভাল রান্নার পরিকল্পনা করছিলেন। স্বামী আবার দাদাকে নিয়ে বেরুবেন এটা তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু সাহাবুদ্দিনের নাম শুনে দেখলাম আর আপত্তি জানালেন না।

রাত সাড়ে নটায় যখন আমরা একটা রেস্টুরেন্টের সামনে পৌঁছলাম তার

একটু আগে সূর্য ডুবেছে। রাস্তায় তখনও মরা আলো লেতিয়ে। রেস্টুরেন্টের বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম এটির আভিজাত্য আছে। অভিজাত রেস্টুরেন্ট মানে মোটা অঙ্কের বিল মেটাতে হবে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। ডানদিকে বার-কাউন্টার, সামনে সুন্দর হলঘর। তাতে কেতাদুরস্ত ওয়েটাররা খাবার পরিবেশন করছে টেবিলে টেবিলে।

'ওয়েলকাম স্যার।' মধ্যবয়সী যে ভদ্রলোক হাসলেন কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর শরীর ছোটোখাটো। ছিপছিপে। ঠোঁটে হাসি।

আব্দুর রহমান এগিয়ে গেলেন, 'দাদারে নিয়ে এলাম।'

'গুড', হাত বাড়ালেন ভদ্রলোক, 'আমি সাহাবুদ্দিন, আপনি আমার দোকানে আসছেন, আমি খুব খুশি। বসেন, এখানেই বসেন।'

লম্বা টুলগুলোর দুটোয় আমরা দুজন বসলাম। সাহাবুদ্দিন যে শুধু আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন তা না, তাঁর চোখ রেস্টুরেন্টের সর্বত্র সমান নজর রাখছিল। দুটো লম্বা গ্লাসে গ্রীনলেবেল হুইস্কি ঢেলে সামনে রাখলেন তিনি।

হেসে বললেন, 'কেমন লাগছে আমার রেস্টুরেন্ট?'

'ভাল। বেশ ভাল।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আমার এখানে কোনও ফালতু খদ্দের পাবেন না। মোস্টলি শিক্ষিত আমেরিকানরা আসে; আর আসে ইন্ডিয়ান স্কলারস। আমি সে ব্যাপারে খুব প্রাউড।' সাহাবুদ্দিন হাত বাড়ালেন। লক্ষ্য করিনি তখনই এক ভদ্রলোক দরজা ঠেলে ঢুকেছেন। করমর্দন করে সাহাবুদ্দিন তাঁকে বললেন, 'বসুন স্যার। আপনি কি এখনই ডিনার খাবেন?'

ভদ্রলোক প্রৌঢ়, মাথায় টাক। বললেন, 'কোনও তাড়া নেই।'

'আলাপ করিয়ে দিই। ইনি বি আর গুপ্তা, ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। আর ইনি সমরেশ মজুমদার। আমাদের ভাষায় গল্প উপন্যাস লেখেন।'

মিস্টার গুপ্তা করমর্দন করলেন, 'বাঃ! আজ আমার কী সৌভাগ্য, একজন লেখক যে এখানে রয়েছেন তা না এলে জানতেই পারতাম না। আপনার লেখার বিষয় কী মিস্টার মজুমদার?'

'রেস।' সাহাবুদ্দিন বললেন। 'হর্সরেস। দারুণ ব্যাপার।'

আমি অবাক হলাম। রেস নিয়ে আমি মাত্র দুটি উপন্যাস লিখেছি। অতএব আমার লেখার বিষয়বস্তু রেস একথা ওই দুটি বইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সামগ্রিকভাবে নয়।

সাহাবুদ্দিন বললেন, 'আপনার বই আমি কোথায় প্রথম পড়ি জানেন? গ্রে-হাউন্ড বাস টার্মিনাসে। আমি তো এদেশে আসছিলাম আমাদের পাকিস্তান আমলে। তখন তো ইন্ডিয়ার বই বেশি দেখি নাই, টু স্পিক ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, আমার রিডিং হ্যাবিট ছিল না। এখানে আসার পর স্ট্রাগল করছি খুব। মেমসাহেব বিয়া করছি। শি ইজ এ নাইস লেডি। তারপর বাংলাদেশ হল। এ ওকে মারে সে তাকে মারে। একটা নতুন দেশ তৈরি হওয়ার সময় নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি আমার ভাল লাগল না। আমি আর বাংলাদেশে যাই নাই। টোয়েন্টি ইয়ার্স ব্যাক, আমি এক রাত্রে পিটাসবার্গ থেকে নিউইয়র্ক আসছিলাম। গ্রে-হাউন্ড বাস টার্মিনাসে বাসের জন্য ওয়েট করতেছি হঠাৎ দেখি মলাট দেওয়া বই বেঞ্চির ওপর পইড়্যা আছে এদেশে পেপার ব্যাক বাসায় নিয়ে যায় না অনেকে। বইটা খুইল্যা দেখি বাংলায় লিখা। তাজ্জব ব্যাপার। এদেশে গ্রে-হাউন্ড বাস টার্মিনাসে বাংলা বই! পড়তে শুরু কইর‍্যা আর ছাড়তে পারি না। খুব ইন্টারেস্টিং। বইটার নাম 'দৌড়'। আপনার লিখা।'

আমিও অবাক কম হইনি। মনে হয় সাহাবুদ্দিন ওই একটি উপন্যাসই পড়েছেন। অনর্গল তাই নিয়ে কথা বলে গেলেন। গুপ্তা সাহেব হাসছিলেন বাংলা শুনে। বললেন, 'একটু একটু বুঝতে পারেন, বলতে পারেন না।'

সেদিন থেকে সাহাবুদ্দিনের রেস্টুরেন্ট আমার রাতের আড্ডাখানা হয়ে গেল। গুপ্তা সাহেব আসেন। দেখলাম, এখানে এলে আব্দুর রহমান তেমন অস্বস্তি বোধ করেন না। দুটো হুইস্কি খেয়ে মাঝরাত পর্যন্ত শ্রোতার ভূমিকায় থাকেন হাসি হাসি মুখ নিয়ে।

সাহাবুদ্দিন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জেনে ফেলেছি। ওঁর স্ত্রী সাদা আমেরিকান। পঁচিশ বছর আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সাহাবুদ্দিন ওঁকে দেখতে পান। ভদ্রমহিলা তাঁর এক আত্মীয়কে দেখতে হাসপাতালে যেতেন। আলাপটা হাসপাতাল থেকে রোগমুক্ত হয়ে আসার পরও চালু ছিল। ওই একটু হাঁটাহাঁটি, রেস্টুরেন্টে বসে কথা বলা, ব্যস! শেষ পর্যন্ত সাহাবুদ্দিন বিয়ের প্রস্তাব দেন। পরের দিনই মেয়েটির বাড়ি থেকে অনুরোধ আসে দেখা করার জন্যে। সাহাবুদ্দিন যান। সেখানে মেয়ের বাবা-মা দাদু-দিদিমা বোনেরা ছিল। গল্প করে চা খেয়ে চলে আসার সময় মেয়ের দিদিমা বলেন, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে তো ভালই লাগল। কিন্তু বাবা, তুমি মুসলমান, ঢাকার বাড়ি। অথচ বলছ তোমার

পাশপোর্ট পাকিস্তানের। ম্যাপে দেখেছি ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। এটা কীরকম ব্যাপার?'

সাহাবুদ্দিনকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হল। এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'আমাদের মেয়ে এখানে বড় হয়েছে। তোমার দেশে গেলে মানাতে পারবে না। তাছাড়া তোমার বাবা-মাকে আমরা জানি না। এরকম অজানা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া কি উচিত?'

সাহাবুদ্দিন জানালেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এদেশেই থেকে যাবেন মেয়েকে অপরিচিত পরিবেশে কখনই যেতে হবে না।

তবু সংশয় যাচ্ছিল না। কিছুদিন টানাপোড়েন চলল। শেষপর্যন্ত রাজি হলেন ওঁরা। বিয়ে হয়ে গেল। স্ত্রী সম্পর্কে সাহাবুদ্দিনের মন্তব্য, 'শি ইজ এ নাইস লেডি।'

গল্প শুনে অবাক হয়ে বললাম, 'আপনার স্ত্রীর পরিবারকে তো ভারতীয় বা বাংলাদেশি বলে মনে হচ্ছে, আমেরিকান বলে ভাবতে পারছি না।'

সাহাবুদ্দিন মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ, ওঁরা খুব কনজারভেটিভ।'

সাহাবুদ্দিনের একটি ছেলে একটি মেয়ে। তারা ইন্ডিয়ান-কারি রাইস খায় কিন্তু বাংলা বলতে পারে না। বড়টা চাকরি করে, ছোটটা মেয়ে, পড়ছে। এ ব্যাপারে সাহাবুদ্দিনের বক্তব্য, 'কেন বাংলা শেখাবো? যে ভাষাটা শিখে ওদের কোন কাজে লাগবে না, ব্যবহার করতে পারবে না তা জোর করে শেখানো মানে ওদের ওপর ট্যাক্স চাপানো।'

আব্দুর রহমান জানালেন, 'সাহাবুদ্দিন স্থানীয় বাংলাদেশি অথবা পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের সঙ্গে মেশেন না। এখানে ওঁদের যেসব সংগঠন আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। কারও বাড়িতে যান না। এ ব্যাপারে ওঁর বক্তব্য, 'আমার ভাল লাগে না তাই যাই না। সিম্পল ব্যাপার। আব্দুর সাহেব একটু আলাদা। তাই ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখি দ্যাট্স অল।'

'তার মানে কোন কোন দিন আপনি একটাও বাংলা কথা বলেন না?'

'কেন? বলি। এভরিডে বলি। আমি গান গাই। শোন বন্ধু শোন, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা। উত্তমকুমারের সব সিনেমা আমার দেখা। তার গান শুনে শুনে মুখস্থ। তাই একা একা গাই।'

মানুষটিকে আমার ভাল লাগল। এদিকে অধ্যাপক শ্রীগুপ্তাকে আমার বেশ রক্ত মাংসের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। অধ্যাপক গুপ্তা রকম উন্নাসিকতা নেই।

প্রায়ই জুয়ো খেলেন। শুনেছিলাম নিউইয়র্কে এখন ক্যাসিনো নেই। আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক গুপ্তা বললেন, 'ঠিকই শুনেছেন। আইন যেমন আছে তেমনি তার ফাঁক আছে। কাছেই সমুদ্র। সেখানে নৌকো রয়েছে আপনাকে আধমাইল দূরের আটলান্টিকের বুকে ভাসা জাহাজে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। জাহাজটি সেখানে স্থির হয়ে থাকে দিনরাত। আর তার ভেতর বিশাল ক্যাসিনো সাজিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের মত জুয়াড়িদের জন্যে। দেশের মাটির আইন আধমাইল দূরে অচল। যাবেন নাকি?'

আমি কলকাতা শহরে কোনও কোনও অধ্যাপককে দিশি মদ খেতে দেখেছি কিন্তু তাঁরা কবিতা লেখেন। সেখানে তিনি অধ্যাপক নন, কবি। কবিরা একটু উলটোপালটা জীবনযাপন করলে লোকে মেনে নেয়। কিন্তু বেশিরভাগ অধ্যাপকই মনে করেন তাঁরা এমন কোন কাজ করতে পারেন না যা তাঁদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা তৈরি করতে পারে। আমাদেরও হয়েছে এমন অবস্থা যে অধ্যাপককে শুধু অধ্যাপক ছাড়া আমরা কিছু ভাবতে চাই না। একটু চিবিয়ে চিবিয়ে জ্ঞানগর্ভ কথা বলবেন, তরল রসিকতা করবেন না, এরকম একটা ছবি আমরা যেমন দেখতে চেয়েছি ওঁরাও তেমনি তৈরি করেছেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় কম। কিন্তু একজন অধ্যাপক ভাল পড়ান, জুয়ো খেলেন, বারে বসে মদ খান, মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাতে আপত্তি নেই, এটা মেনে নেওয়া ছাত্রদের পক্ষে যেমন কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। ক্লাসের বাইরে ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কেন তার নিজের থাকবে না তা নিয়ে প্রশ্ন বড় একটা কেউ তোলেন না। তাই অধ্যাপক গুপ্তাকে আমার রক্ত মাংসের মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

অধ্যাপক গুপ্তা আমেরিকায় এসেছেন বছর কুড়ি। তার আগে জার্মানিতে ছিলেন।

বিয়ে করেছিলেন কিন্তু মতে মেলেনি বলে আলাদা হয়ে গেছেন। এখন একাই থাকেন। ওঁর সঙ্গে কয়েকদিন আড্ডার পর জানতে পারলাম, ভদ্রলোক ভোরে উঠেই হাঁটাহাঁটি করেন পাঁচ কিলোমিটার। ফিরে এসে নিজের বিষয়ের বই নিয়ে পড়াশুনো করেন সকাল নটা পর্যন্ত। তারপর ব্রেকফাস্ট বানিয়ে স্নান খাওয়া শেষ করে কলেজে যান পড়াতে। ক্লাস এবং লাইব্রেরি করে বাড়ি আসেন পাঁচটায়। তারপর সেজেগুজে বের হন সাড়ে ছটায়। কখনও জুয়ো খেলেন, পাবে পাবে ঘুরে মদ খান, বান্ধবীদের সঙ্গে আনন্দ করেন এবং ফিরে যান সাড়ে এগারটায়।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'দেখতে পাচ্ছি মাত্র পাঁচ ঘণ্টার বেশি আপনি ঘুমোন না!'

'হ্যাঁ! ওর বেশি ঘুমিয়ে থাকলে সময়ের অপচয় হয়। আমাদের জীবন তো খুব বেশিদিনের জন্যে নয়। শরীর চালু রাখতে পাঁচ ঘণ্টার ঘুম যথেষ্ট।'

লক্ষ্য করেছি আব্দুর রহমান ছাড়া কোন বাংলাদেশি বন্ধু যে সাহাবুদ্দিনের নেই তেমনই অধ্যাপক গুপ্তারও কোনও ভারতীয় বন্ধু নেই।

সাহাবুদ্দিনের কথাবার্তা চালচলন দেখে মনে হয় না তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখে আছেন। স্ত্রী এবং সন্তান বাংলায় কথা বলে না, বাংলা গান শোনে না। তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। কিন্তু স্ত্রীকে তিনি কয়েকটি বাঙালি রান্না শিখিয়ে দিয়েছেন। সেগুলো তিনি নাকি চমৎকার রাঁধেন। আমাকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিচ্ছি না। না দেওয়ার কারণ হল জীবনে বাংলা পড়বে না। অতএব আপনার পরিচয় ওর কাছে কোন আলাদা মর্যাদা পাবে না।' একেবারে সোজাসাপটা কথা। আমার ভাল লেগেছিল।

একরাতে অধ্যাপক গুপ্তা বললেন, 'দিন পাঁচেক থাকব না।'

'কোথাও যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, একটু বরফের দেশে। ক্লাস ছুটি আছে, ঘুরেই আসি। আপনি কবে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন?'

'এখনও কিছুদিন আছি।' বলতে বলতেই মনে হল প্রস্তাবটা করে দেখি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি একার উদ্যোগে যাচ্ছেন না কোন দলের সঙ্গে?'

'দুটোই'। হাসলেন অধ্যাপক গুপ্তা, 'নিউইয়র্কে কিছু কিছু ভ্রমণ সংস্থা মাঝেমাঝেই অন্যরকম ভ্রমণের ব্যবস্থা করে। এই পাঁচদিনের ট্রিপ। এখান থেকে প্লেনে যতটা সম্ভব গিয়ে বাকিটা স্টিমারে। লিমিটেড সিট, ডলার দিয়ে সদস্য হয়ে যাও যতক্ষণ সেই সংখ্যাটা পূর্ণ না হয়।'

'আমি কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি মিস্টার গুপ্তা।'

'ওয়েল, এটা তো তাই। শহরের বাঁধাধরা জীবনের বাইরে।'

'খরচ কেমন?'

'বারোশ ডলার। এটা সবচেয়ে সস্তা।'

সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে গেলাম। এত ঘোরাঘুরির পর ওই পরিমাণ ডলার দূরের কথা, এর এক-চতুর্থাংশই আমার পকেটে আছে। যদি আর এ যাত্রায় দেখা না হয় তাই করমর্দন করে আব্দুর রহমানের সঙ্গে রাত্রে বাড়ি ফিরে এলাম। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম এমন সময় কবে আসবে যেদিন ভারতবর্ষের একটি টাকা আমেরিকান এক ডলারের সমান হবে। এখন আমাদের চুয়াল্লিশ টাকায় মাত্র একটা ডলার পাওয়া যায়। অতএব বারো শো ডলার মানে প্রায় তিপ্পান্ন হাজার টাকা। তাই খরচ করে পাঁচদিনের জন্যে বেড়াতে যাওয়ার বিলাসিতা আমি করতে পারি না।

কিন্তু আমার জন্যে যে বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তা পরের দিন সকাল দশটা পর্যন্ত জানতাম না। বিশেষ ক্যুরিয়ার সার্ভিসে একটা খাম এল আমার নামে। খুলে দেখলাম তাতে একটা প্লেন টিকিট এবং এস এস রুজভেল্ট নামের একটি জাহাজে থাকার ছাড়পত্র রয়েছে। কলম্বাস কোম্পানি নামের একটি ভ্রমণ সংস্থা জানিয়েছে আমি যেন অবশ্যই বিকেল আড়াইটের মধ্যে বিমানবন্দরে চলে আসি কারণ বিমান ছাড়বে ঠিক তিনটের সময়।

আমি হতভম্ব। কে পাঠাল এই টিকিট? এর দাম তো বারোশ ডলার। আব্দুর রহমান খুব অবাক হয়েছিলেন। তিনি সরাসরি সাহাবুদ্দিনকে ফোন করলেন। তারপর কথাবার্তা বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। জানতে পারলাম কাল রাত্রে আমাদের কথাবার্তা নীরবে শুনেছিলেন সাহাবুদ্দিন। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শুধু টাকার জন্যে যাচ্ছি না বলে ওঁর খারাপ লেগেছিল। 'দৌড়' পড়ার স্মৃতি তাঁর

কাছে মূল্যবান বলে তিনি টিকিটটি কিনে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি খুব খুশি কারণ এটিই ছিল আজকের যাত্রার শেষ টিকিট। উনি আব্দুর রহমানকে বলেছেন এখন যেন আমি ফোন না করি, কারণ ফোন করলেই আমি নিশ্চয়ই তাঁকে ধন্যবাদ জানাব। এতে ওঁর অস্বস্তি হবে। বরং ভালভাবে ঘুরে এসে যেন যাওয়ার আগের রাত্রে ওঁর রেস্টুরেন্টে একটা ভাল ডিনার খেয়ে যাই। ব্যস!

আমার দ্বিধা হচ্ছিল কিন্তু আব্দুর রহমান জোর করলেন। ভালবাসার দান উপেক্ষা করতে নেই। বললেন, 'যে মানুষটা কোনও বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে একটা ডলার চাঁদা দেয় না সে আপনার জন্য বারোশ ডলার খরচ করেছে? আমি খুব খুশি।'

আব্দুর রহমান আমাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

কানাডায় যেতে আমেরিকান নাগরিকদের ভিসার দরকার পড়ে না। কিন্তু আমাদের অবশ্যই ভিসা নিতে হয়। সাধারণত নায়েগ্রা ফলস ভাল করে দেখার জন্যে কানাডার অংশে যাওয়ার প্রয়োজনে অনেকেই ওই ভিসা নিয়ে নেয়। এবার আমার নায়েগ্রা দেখার কোন বাসনা ছিল না। দু-দুবার দেখা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ফলে কানাডায় যাওয়ার ভিসা নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

টিকিট এবং পাশপোর্ট হাতে নিয়ে সুদর্শনা এয়ারলাইনসের তরুণীটি বলল, 'আপনি কানাডায় যাচ্ছেন, ওখানকার ভিসা কোথায়?'

আমি ঘটনাটা জানালাম, কিভাবে এবং কেন আমি এয়ারপোর্টে এসেছি। কোম্পানি ডলার নিয়ে টিকিট পাঠিয়েছে সেই কলম্বাস কোম্পানিকে টেলিফোন করলেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি বললেন, 'এয়ারপোর্ট থেকে আপনার জন্যে ভিসার ব্যবস্থা করবে। ভিসা না পেলে কিন্তু পরের ফ্লাইটে আপনাকে ফেরত আসতে হবে।'

আমি বোর্ডিং কার্ড হাতে পেলাম। তাতে লেখা জে এফ কে থেকে সাচ্‌স হারবার। জিজ্ঞাসা করে জানলাম এয়ারপোর্টটি কানাডার ব্যাঙ্কস অফ আইল্যান্ডে। সেখানে এখনই ঠাণ্ডা মাইনাস পাঁচে, ভরদুপুরে। কলকাতা থেকে যা প্যান্ট-জামা নিয়ে এসেছিলাম সেগুলো তেমন কাজ দেবে না বলে আব্দুর রহমান ওভারকোট, গ্লাভস, টুপি ইত্যাদি আমাকে যোগান দিয়েছিল। ওপরে ফুল হাতা সোয়েটার থাকলে নিউইয়র্কে শীতকালে ওগুলো পরলে দিব্যি নাকি চলে যায়!

স্যুটকেশ নিয়ে নির্দিষ্ট গেটের সামনে পৌঁছতেই গলাটা কানে এল। সেখানে

প্লেনে ওঠার ডাক শোনার জন্যে যেসব যাত্রীরা অপেক্ষা করছেন তাঁদের ভেতর থেকে এগিয়ে এলেন অধ্যাপক গুপ্তা। হাত বাড়িয়ে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি? কই কাল রাতে তো কিছু বললেন না!'

ঘটনাটা জানালাম।

গুপ্তা মাথা নাড়ালেন, 'তাই বলুন, আজ সকালে সাহাবুদ্দিন আমাকে ফোন করে কলম্বাস কোম্পানির টেলিফোন নাম্বার নিয়েছিল। কারণটা তখন ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি। যাক গে, খুব ভাল হল, কটা দিন জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।'

বললাম, 'আমি কিন্তু কিছুই জানি না। তাছাড়া কানাডায় ঢোকার ভিসা আমার নেই।'

'এইটে সমস্যা হতে পারে। তবে কলম্বাস চেষ্টা করলে শর্তসাপেক্ষে এয়ারপোর্টে নামার পর ভিসার ব্যবস্থা করতে পারে। স্পট ভিসা।' ব্যাগ খুলে একটা রঙিন কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'পড়ে ফেলুন।'

কিন্তু তখনই ডাক এল। বোর্ডিং কার্ড পাশপোর্ট দেখিয়ে উঠে পড়তে হল প্লেনে।

আমাদের আসন পাশাপাশি নয়। পেছনে জানলার ধারে বসতেই এক নীলনয়না সুন্দরী এসে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে জানলার আসন ছেড়ে দিতে আমার খুব অসুবিধে হবে কিনা! মহিলার চুল কোমর ছাড়ানো এবং কালো। গায়ের রঙ গমের মত। নির্দ্বিধায় সরে এলাম। ধন্যবাদ জানিয়ে সুন্দরী জানলার পাশে বসে পড়লেন।

গুপ্তার দেওয়া কাগজটা বের করে চোখ রাখলাম। আমরা পৌঁছেছি কানাডার মাথায় ব্যাঙ্কস অফ আইল্যান্ডে। জায়গাটির নাম সাচ্‌স হারবার। লক্ষ করলাম বেশিরভাগ নামই ইংরেজিতে নয়, ব্র্যাকেটে কিছু কিছু জায়গায় ইংরেজি নাম দেওয়া আছে। ওই সাচ্‌স হারবার থেকেই আমাদের জাহাজ ছাড়বে। দেখেশুনে মনে হল বারোশ ডলার এতটা ভ্রমণের পক্ষে নেহাতই কম। জাহাজ আর্টিক সমুদ্রের প্রান্ত ধরে কেপ প্রিন্স এ্যালফ্রেড হয়ে ব্যাঙ্কস অফ আইল্যান্ডটাকে পাক খেয়ে আবার ফিরে আসবে সাচ্‌স হারবারে। এই যাত্রা যে কত মনোমুগ্ধকর তার বর্ণনা দেওয়া আছে কাগজটায়।

ছেলেবেলায় পড়েছিলাম উত্তর মেরু যেতে আর্টিক সমুদ্র পার হতে হয়। উত্তর মেরুতে চিরস্থায়ী কঠিন বরফের বিশাল এলাকা রয়েছে। এই জাহাজ সেদিকে যাবে না। কিন্তু যেখানে যাচ্ছে সেখানে যে ওভারকোটের কোন মূল্য নেই ছবি দেখে বুঝতে পারছিলাম।

প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ওড়ার পর পাশের সুন্দরী বালিকার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'কী ভয়ংকর সুন্দর! এত বরফ আমি জীবনে দেখিনি। আমরা বোধহয় পৌঁছে গিয়েছি, তাই না?'

বললাম, 'আমি প্রথমবার এদিকে আসছি। তাছাড়া দেখছেন আপনি, আমি নই।'

'ও, তাই! আমি আপনাকে বঞ্চিত করেছি, না?'

সুন্দরী মেয়েরা চিরকালই পুরুষদের বঞ্চিত করে, কথাটা বলতে গিয়েও না বলে কাঁধ ঝাঁকালাম। যেন কিছুই হয়নি।

'আপনি তো আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন?'

'তাই তো যাচ্ছি।'

'না না। কলম্বাসের ট্যুরের মেম্বার তো আপনি?'

'হ্যাঁ।'

সাড়ে চার ঘণ্টা পাশাপাশি ওড়ার পর সুন্দরীর খেয়াল হল। হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'ওয়েলকাম। আমি পামেলা, কলম্বাসের ট্যুর ম্যানেজার, ওই কাগজটা যদি আগে বের করতেন তাহলে এতক্ষণ অনেক কথা বলা যেত। আপনার নাম?'

'সমরেশ। ইন্ডিয়া থেকে আসছি।'

'ওহো! আপনিই সেই লোক!'

'মানে?'

'আজ সকালে যে শেষ টিকিটটি বিক্রি হয়েছে সেটি এক ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকের জন্যে যার কানাডার ভিসা নেই, সেই ভদ্রলোক আপনি। তাই তো?'

হেসে ফেললাম, 'হ্যাঁ।'

'আমাদের কোম্পানির কানাডার শাখাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা আপনার জন্যে চেষ্টা করবে।' সুন্দরী আমাকে আশ্বস্ত করলেন।

আজকাল প্লেনের পেট থেকে সুড়ঙ্গ ধরে হেঁটে আসা যায় এয়ারপোর্ট টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের ভেতরে। পুরোটাই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বলে বাইরের আবহাওয়া কোন সমস্যা হয় না। প্লেন গন্তব্যে পৌঁছবার সময় পাইলট জানিয়ে দিয়েছেন এখন বাইরের তাপমাত্রা মাইনাস দশ। কাছে যেতেই শরীর শির শির করে উঠল।

ইমিগ্রেশনের জন্যে লাইন দিয়েছিলাম অধ্যাপক গুপ্তার সঙ্গে। সেই সুন্দরী কোথায় গিয়েছিলেন জানি না, ফিরে এসে আমাকে বললেন, 'সমরেশ, আমার সঙ্গে আসুন।'

অতএব যেতে হল। কানাডা সরকারের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা ছাড়পত্র না দিলে কেউ এই এলাকার বাইরে যেতে পারবে না। আমাকে লাইন থেকে বের করে সুন্দরী খানিকটা হাঁটিয়ে যে ঘরটিতে নিয়ে গেলেন সেখানে একজন সাদা মোটাসোটা অফিসার বসে আছেন।

ঢোকামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি করে মনে হল যে আমেরিকার ভিসা নিয়ে ইন্ডিয়া থেকে এলেই আপনাকে কানাডিয়ান ভিসা দেওয়া হবে?'

বললাম, 'একথাটা আমার একবারও মনে আসেনি।'

'তাহলে ভিসা আগে নেননি কেন?'

'কারণ আমি জানতাম না এখানে আসব। বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার সময় এয়ারলাইন্স থেকে আমাকে বলা হয়েছে এখানে পৌঁছে ভিসার জন্যে আবেদন করতে।'

'অসম্ভব।' হাত নাড়লেন ভদ্রলোক। 'আপনাকে ভিসা দিলে আপনি যে ফেরৎ যাবেন তার তো কোনও গ্যারান্টি নেই।'

'আমি এই বরফের দেশে থেকে কী করব?'

'এখানে থাকবেন কেন? যেখানে বরফ নেই কানাডার সেইসব জায়গায় চলে যাবেন। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান-বাংলাদেশের হাজার হাজার লোক তো এখন এই কানাডায় জমিয়ে বসেছে। কোনও বিশ্বাস নেই।'

'কিন্তু আমি রোজগার করব কী করে? একমাত্র লেখা ছাড়া তো কিছু জানি না।'

'লেখা? আপনি কী লেখেন?'

'গল্প উপন্যাস।' গম্ভীর মুখে বললাম, 'বাংলা ভাষায়, যা এখানে চলবে না।'

'তা ঠিক।' ভদ্রলোক সুন্দরীকে বললেন, 'আপনারা তো বলেননি উনি লেখক? একজন লেখকের সঙ্গে আমরা এমন ব্যবহার করতে পারি না। কথাটা আগে বললে আমাকে এত কথা বলতে হত না। আপনি দয়া করে এই ফর্মটা ভর্তি করুন। কলম্বাস কোম্পানি গ্যারান্টি দিচ্ছে, আর আপনার পাশপোর্টটাও আমরা রেখে দিচ্ছি। তার বদলে দেশে ঢোকার জন্যে এক অস্থায়ী পারমিট ইস্যু করছি। ফেরার সময় ওটা ফেরৎ দিলে পাশপোর্ট পেয়ে যাবেন।'

কলকাতা শহরের কর্পোরেশন অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস অথবা যে কোন সরকারি অফিসে একজন লেখকের চেয়ে একজন কালোবাজারিকে বেশি খাতির করা হয়। বাংলাদেশে লেখক বলে কাউকে চিনতে পারলে যেভাবে সাহায্যের হাত এগিয়ে আসে তাতে অবাক হতে হয়। আর সুদূর কানাডায় এই বরফের দ্বীপে একজন বিদেশি যিনি আমার লেখা জীবনে পড়তে পারবেন না তিনি লেখক পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে নিজেকে বদলে ফেললেন তাতে মন ভাল হয়ে গেল।

ইমিগ্রেশন অফিসারদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হলঘরে আসায় ওঁদের দেখতে পেলাম। অধ্যাপক গুপ্তা বললেন, 'যাক, ভিসা দিয়েছে আপনাকে। এখন চট্‌জলদি যা যা শীতবস্ত্র নিয়ে এসেছেন পরে ফেলুন।'

'কেন?'

'বাইরে বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাসটা এয়ারকন্ডিশনড কিন্তু হেঁটে গিয়ে তাতে উঠতে হয়। বাইরে তো মাইনাস।' ব্যাগ খুলে ভদ্রলোক ধড়াচূড়া বের করে পরতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে আর চেনা যাচ্ছিল না। আব্দুর রহমানের দেওয়া পোশাক পরে দলের সঙ্গে বাইরে এসে দেখলাম সবাই ছুটছে। আমিও পা চালালাম। বাসে ওঠার পর বুঝতে পারলাম ওভারকোট, সোয়েটার,

সার্ট, উলিকটের গেঞ্জি থাকা সত্ত্বেও শরীরে ভয়ংকর শীতল ঢেউ যেন পাক খাচ্ছে। বাসের ভেতরকার গরমও যেন সেটাকে কমাতে পারছে না।

গুপ্তা বললেন, 'প্রথমবার ওই ঠাণ্ডায় হাঁটলে অনেকের কোল্ড স্ট্রোক হয়ে যায়। এখন আরাম করে বসুন।' বলে পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বের করে মুখে ঢেলে ওটা এগিয়ে ধরলেন। আমি দিনের বেলায় কখনই মদ পান করি না। কিন্তু ওই কাঁপুনিটা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক ঢোক শরীরে চালান করলাম। উষ্ণ স্রোতটা গলা দিয়ে নামতেই কাঁপুনিটা মিলিয়ে গেল। বেশ ভাল লাগল। এই প্রথম জল ছাড়া পান করলাম। একটুও কড়া বলে মনে হল না।

এত ঠাণ্ডার দেশে কী করে যে এমন সুন্দর রাস্তা এরা তৈরি করেছে আমি ভাবতেই পারছিলাম না। সাচ্‌স হারবার মূলত সামুদ্রিক ঠাণ্ডা জলের মাছ ধরার জন্যে বিখ্যাত। সীল, তিমি থেকে শুরু করে হরেকরকম বরফের মাছ ধরে এনে এখানে জমা হয়। তারপর তাদের কেটেকুটে টিনে ভর্তি করে দেশে-বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বাড়িঘর রয়েছে কিন্তু ঘনবসতি নয়। রাস্তায় গাড়ি দেখতে পাচ্ছি।

এই সময় সুন্দরী মহিলাটি বাসের মাইকে কথা বললেন, 'সুস্বাগতম। মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যে আপনারা এত কষ্ট করে যে ভ্রমণে এসেছেন তা যাতে সুন্দরভাবে শেষ হয় তার জন্যে কলম্বাস কোম্পানির তরফ থেকে আমি, পামেলা, আপ্রাণ চেষ্টা করব। প্রথমেই বলে রাখি, বাইরে এখন এই সময় যে ঠাণ্ডা পড়ে তা থেকে একটু বেশি পড়েছে। আমরা যাচ্ছি বন্দরে যেখানে আপনাদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের জাহাজ রুজভেল্ট অপেক্ষা করছে। রুজভেল্ট ছোট জাহাজ কিন্তু সবরকম প্রমোদের ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে। পুরো জাহাজ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু কানাডার আইন অনুযায়ী জাহাজ বন্দর এলাকা ছেড়ে একমাইল দূরে না যাওয়া পর্যন্ত ক্যাসিনো চালু হবে না। এই আইন মানতে আমরা বাধ্য। এই যাত্রায় মাত্র একবারই আপনাদের জাহাজ ছেড়ে বরফের রাজত্বে নামবার অনুমতি দেওয়া হবে এবং সেটা চারঘণ্টার জন্যে যেখানে পেঙ্গুইনরা রাজত্ব করছে। যাঁরা ধূমপান করেন তাঁদের অনুরোধ করছি জাহাজের ভেতরে যে ধূমপানকক্ষ রয়েছে সেখানে গিয়ে ধূমপান করবেন।'

কথা শেষ হওয়ামাত্র একজন কালো ভদ্রলোক হাত তুললেন, 'আমি কি আমার ঘরে বসে চুরুট খেতে পারব না?'

পামেলা বললেন, 'মাত্র তিনটি কেবিন স্মোকার্স কেবিন হিসেবে নির্দিষ্ট। আপনি যদি তার একটিতে জায়গা পান তাহলে খেতে পারবেন। না হলে আপনাকে ধূমপান কক্ষে কষ্ট করে যেতে হবে।'

লোকটি বললেন, 'আমি ওই কেবিনে থাকতে চাই।'

'আপনার নাম, স্যার?'

'টমাস।'

বাস জাহাজঘাটায় পৌঁছলো। আমরা রুজভেল্টের পাশে পৌঁছালাম, ছোট্ট জাহাজ কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর। ওয়াকিটকিতে কথা বললেন পামেলা। তারপরেই জাহাজের পেট খুলে একটা সিঁড়ি নেমে এল। দুজন অফিসার আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে ঢেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। বাসটাকে প্রায় সিঁড়ির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। পামেলা ঘোষণা করলেন, 'অনুগ্রহ করে একজন করে বাস থেকে নামবেন যাতে বাকিদের ঠাণ্ডায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়।'

যেহেতু আমি প্রায় শেষে বাসে উঠেছিলাম তাই নামবার সময় তৃতীয় ব্যক্তি হলাম। মদ্যপানের কারণেই কিনা জানি না এবার কাঁপুনিটা এল না।

একজন অফিসার বললেন, 'টিকিট প্লিজ! আপনি একা?'

মাথা নেড়ে টিকিট বের করে এগিয়ে দিতে তিনি দেখে নিয়ে একটা প্লাস্টিকের চাকতি এগিয়ে ধরলেন, 'এটাকে সাবধানে রাখবেন। গো অ্যাহেড।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম অনায়াসেই। চাকতিতে লেখা আছে কেবিন নম্বার নাইন। ভেতরে ঢুকে সুন্দর ছোট্ট হলঘর দেখতে পেলাম। সেখানে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের একজন এগিয়ে এসে চাকতিটা দেখে স্যুটকেশ নিয়ে নিলেন হাত থেকে। তাঁকে অনুসরণ করে প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে আমি একতলায় নেমে এলাম। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি কেবিন। নয় নম্বরের চাবি খুলে স্যুটকেশ ভেতরে রেখে লোকটি আমার হাতে চাবি দিয়ে দিলেন।

কেবিনে ঢুকে আমি মুগ্ধ। সামনেই বিরাট কাচের জানলা। জানলার ওপাশে সমুদ্রের জল স্থির। যেন সমুদ্রটাই কেবিনে ঢুকে পড়েছে। এসব দৃশ্য জীবনে দেখিনি। একটাই খাট। তাতে দারুণ বিছানা। লেপটি খুব মোলায়েম। ঘরে ছোট আলমারি, একটা টেবিল চেয়ার ছাড়া টিভি রয়েছে। লাগোয়া ছোট্ট টয়লেট কিন্তু স্নানের কোনও ব্যবস্থা নেই। ধরেই নেওয়া যায়, ভেতরটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হলেও এই ঠাণ্ডায় কেউ স্নান করবে না। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শরীর এলিয়ে

দিলাম। শুয়ে শুয়েই সমুদ্র দেখছি। নিস্তরঙ্গ জলরাশি। সেই জল যে কী পরিমাণ শীতল হবে কল্পনা করতে পারছি।

টেবিলে নানারকমের রঙিন বুলেটিন সাজানো। এই জাহাজের কোথায় কী পাওয়া যাবে তার বিশদ বিবরণ। একটা কাগজে চোখ পড়ল, এস এস রুজভেল্ট, ১৯০৮। আমরা যে জাহাজে উঠেছি তার নামকরণ করা হয়েছে বিরানব্বই বছর আগে নিউইয়র্ক বন্দর ছেড়ে আসা এই নামের জাহাজ থেকে। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে এস এস রুজভেল্ট নিউইয়র্ক থেকে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। বেশ কয়েকটা সপ্তাহের পর জাহাজটি গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিমতীর থেকে একশ তিরিশ টন শুকনো তিমির মাংস, দুশো ছেচল্লিশটি স্লেজটানা কুকুর এবং উনপঞ্চাশটি এস্কিমো পুরুষ নারী শিশুকে তুলে নিয়ে আবার এগিয়ে গেল। গ্রীনল্যান্ড এবং এলেসমেয়ার দ্বীপের মাঝখানে বরফভর্তি সমুদ্র দিয়ে কোনও মতে এগিয়ে তিনশো পঞ্চাশ মাইল দূরত্ব পার হয়ে কেপ শেরিড্যানে পৌঁছাতে পারল। সেখান থেকে উত্তর মেরু মাত্র পাঁচশ মাইল।

আমাদের জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে গ্রীনল্যান্ড এবং এলেসমেয়ার দ্বীপ ছাড়িয়ে প্রায় সমান্তরাল রেখায়। রাত্রে এখনই এখানে মাইনাস একশ চল্লিশে তাপমাত্রা নেমে যায়। আমরা কেপ কেলেট-কেপ প্রিন্স অ্যালফ্রেড হয়ে ব্যাঙ্কস অফ আইল্যান্ডকে একটা পাক দিয়ে প্রিন্স অফ ওয়েলস প্রণালীতে ঢুকে পড়ব। তারপর কোপ ল্যাম্বটন হয়ে আবার এই সাচ্‌স হারবারে ফিরে আসবে জাহাজটা। ওই প্রিন্স অফ ওয়েলস প্রণালীতে ঢুকে জাহাজ জায়গা বুঝে দাঁড়াবে অতি উৎসাহীদের বরফের উপর বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ দিতে। আমার সঙ্গে যে পোশাক রয়েছে তা প'রে ওখানে জাহাজ থেকে নামা মানে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া, তাই ওই চিন্তা করছি না।

এখানে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, বিকেলের চা-জলখাবার এবং ডিনারের যে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া আছে তার মধ্যে খেতে যেতে অনুরোধ করা হয়েছে। এর বাইরে যেতে চাইলে আলাদা দাম দিতে হবে। মদ কিনে খেতে হবে।

পামেলা বললেন, 'মাত্র তিনটি কেবিন স্মোকার্স কেবিন হিসেবে নির্দিষ্ট। আপনি যদি তার একটিতে জায়গা পান তাহলে খেতে পারবেন। না হলে আপনাকে ধূমপান কক্ষে কষ্ট করে যেতে হবে।'

লোকটি বললেন, 'আমি ওই কেবিনে থাকতে চাই।'

'আপনার নাম, স্যার?'

'টমাস।'

বাস জাহাজঘাটায় পৌঁছলো। আমরা রুজভেল্টের পাশে পৌঁছালাম, ছোট্ট জাহাজ কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর। ওয়াকিটকিতে কথা বললেন পামেলা। তারপরেই জাহাজের পেট খুলে একটা সিঁড়ি নেমে এল। দুজন অফিসার আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে ঢেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। বাসটাকে প্রায় সিঁড়ির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। পামেলা ঘোষণা করলেন, 'অনুগ্রহ করে একজন করে বাস থেকে নামবেন যাতে বাকিদের ঠাণ্ডায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়।'

যেহেতু আমি প্রায় শেষে বাসে উঠেছিলাম তাই নামবার সময় তৃতীয় ব্যক্তি হলাম। মদ্যপানের কারণেই কিনা জানি না এবার কাঁপুনিটা এল না।

একজন অফিসার বললেন, 'টিকিট প্লিজ! আপনি একা?'

মাথা নেড়ে টিকিট বের করে এগিয়ে দিতে তিনি দেখে নিয়ে একটা প্লাস্টিকের চাকতি এগিয়ে ধরলেন, 'এটাকে সাবধানে রাখবেন। গো অ্যাহেড।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম অনায়াসেই। চাকতিতে লেখা আছে কেবিন নম্বার নাইন। ভেতরে ঢুকে সুন্দর ছোট্ট হলঘর দেখতে পেলাম। সেখানে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের একজন এগিয়ে এসে চাকতিটা দেখে স্যুটকেশ নিয়ে নিলেন হাত থেকে। তাঁকে অনুসরণ করে প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে আমি একতলায় নেমে এলাম। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি কেবিন। নয় নম্বরের চাবি খুলে স্যুটকেশ ভেতরে রেখে লোকটি আমার হাতে চাবি দিয়ে দিলেন।

কেবিনে ঢুকে আমি মুগ্ধ। সামনেই বিরাট কাচের জানলা। জানলার ওপাশে সমুদ্রের জল স্থির। যেন সমুদ্রটাই কেবিনে ঢুকে পড়েছে। এসব দৃশ্য জীবনে দেখিনি। একটাই খাট। তাতে দারুণ বিছানা। লেপটি খুব মোলায়েম। ঘরে ছোট আলমারি, একটা টেবিল চেয়ার ছাড়া টিভি রয়েছে। লাগোয়া ছোট্ট টয়লেট কিন্তু স্নানের কোনও ব্যবস্থা নেই। ধরেই নেওয়া যায়, ভেতরটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হলেও এই ঠাণ্ডায় কেউ স্নান করবে না। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শরীর এলিয়ে

দিলাম। শুয়ে শুয়েই সমুদ্র দেখছি। নিস্তরঙ্গ জলরাশি। সেই জল যে কী পরিমাণ শীতল হবে কল্পনা করতে পারছি।

টেবিলে নানারকমের রঙিন বুলেটিন সাজানো। এই জাহাজের কোথায় কী পাওয়া যাবে তার বিশদ বিবরণ। একটা কাগজে চোখ পড়ল, এস এস রুজভেল্ট, ১৯০৮! আমরা যে জাহাজে উঠেছি তার নামকরণ করা হয়েছে বিরানব্বই বছর আগে নিউইয়র্ক বন্দর ছেড়ে আসা এই নামের জাহাজ থেকে। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে এস এস রুজভেল্ট নিউইয়র্ক থেকে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। বেশ কয়েকটা সপ্তাহের পর জাহাজটি গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিমতীর থেকে একশ তিরিশ টন শুকনো তিমির মাংস, দুশো ছেচল্লিশটি স্লেজটানা কুকুর এবং উনপঞ্চাশটি এস্কিমো পুরুষ নারী শিশুকে তুলে নিয়ে আবার এগিয়ে গেল। গ্রীনল্যান্ড এবং এলেসমেয়ার দ্বীপের মাঝখানে বরফভর্তি সমুদ্র দিয়ে কোনও মতে এগিয়ে তিনশো পঞ্চাশ মাইল দূরত্ব পার হয়ে কেপ শেরিড্যানে পৌঁছাতে পারল। সেখান থেকে উত্তর মেরু মাত্র পাঁচশ মাইল।

আমাদের জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে গ্রীনল্যান্ড এবং এলেসমেয়ার দ্বীপ ছাড়িয়ে প্রায় সমান্তরাল রেখায়। রাত্রে এখনই এখানে মাইনাস একশ চল্লিশে তাপমাত্রা নেমে যায়। আমরা কেপ কেলেট-কেপ প্রিন্স অ্যালফ্রেড হয়ে ব্যাঙ্কস অফ আইল্যান্ডকে একটা পাক দিয়ে প্রিন্স অফ ওয়েলস প্রণালীতে ঢুকে পড়ব। তারপর কোপ ল্যাম্বটন হয়ে আবার এই সাচ্‌স হারবারে ফিরে আসবে জাহাজটা। ওই প্রিন্স অফ ওয়েলস প্রণালীতে ঢুকে জাহাজ জায়গা বুঝে দাঁড়াবে অতি উৎসাহীদের বরফের উপর বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ দিতে। আমার সঙ্গে যে পোশাক রয়েছে তা প'রে ওখানে জাহাজ থেকে নামা মানে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া, তাই ওই চিন্তা করছি না।

এখানে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, বিকেলের চা-জলখাবার এবং ডিনারের যে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া আছে তার মধ্যে খেতে যেতে অনুরোধ করা হয়েছে। এর বাইরে যেতে চাইলে আলাদা দাম দিতে হবে। মদ কিনে খেতে হবে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল আমি দুলছি। চোখ খুলতেই ভয়ে চিৎকার করতে গিয়ে সামলে নিলাম। একটা বিরাট ঢেউ যেন আমার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। জাহাজ চলছে। কেবিনে আলো জ্বলছে কিন্তু বাইরেটা এখনও আলোকিত দিনের আলোয়। জানলার কাচে সামুদ্রিক ঢেউ আছড়ে পড়ছে। মাইনাস সত্ত্বেও এখানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়ে যায়নি। সূর্য কখন অস্ত যায়? শুনেছিলাম এদিকে ছয়মাস আলো থাকে বাকিটা অন্ধকার। একবার কোপেনহেগেনে রাত দুটোয় ঘুম থেকে উঠে রোদ দেখেছিলাম। কিন্তু বাইরের আলোয় কোনও তেজ নেই। হঠাৎ দুটো মাছকে জল থেকে লাফিয়ে জানলার কাচের সামনে চলে আসতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে যাচ্ছিল ওগুলো। ঘড়িতে এখন রাত সাড়ে নটা। দশটায় ডিনার বন্ধ হয়ে যাবে।

চটজলদি তৈরি হয়ে কেবিন থেকে বের হলাম। কোনও দামি জিনিস সঙ্গে নেই বলে চাবি দিলাম না। ম্যাপটার ওপর চোখ রেখে ডাইনিং রুমে পৌঁছে দেখি মাত্র তিনজন মানুষ সেখানে যাচ্ছেন। আমাদের দেশে যে কোনও ব্যাপারে শেষ সময়ে খুব ভিড় হয়। ইলেকট্রিক বা টেলিফোন বিল জমা দেওয়া বা খাওয়াদাওয়া, শেষ সময়ে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। কিন্তু বুঝলাম অধিকাংশই খাওয়া শেষ করেছেন।

খাবার নিয়ে একটা টেবিলে বসেছি, এইসময় পামেলা এবং আর একজন তরুণী এলেন। সঙ্গিনীকে দেখে কলম্বাসের কর্মী বলে মনে হল না। কাউন্টার থেকে নির্বাচিত খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এপাশে তাকাতেই পামেলা আমাকে দেখতে পেলেন। ওঁর মুখে হাসি ফুটল, সঙ্গিনীকে কিছু বলতেই তিনি বেশ অবাক চোখে আমাকে দেখলেন। ওঁরা এগিয়ে এলেন আমার দিকে। পামেলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বসতে পারি?'

'অবশ্যই।'

ওঁরা বসলেন। পামেলা বললেন, 'কেমন লাগছে এখন?'

'আমার কেবিনে বসে পুরো ট্রিপটা কাটিয়ে দেওয়া যায়।'

'প্লিজ, সেটা করবেন না। ওপরে চলে যাবেন। ওখানে ক্যাসিনো আছে, বিলিয়ার্ড রুম, কার্ড রুম আছে। তাছাড়া কাচের ঘরে গেলে আপনি চারপাশের আদিম প্রকৃতি দেখতে পাবেন। খুব ভাল লাগবে। ওহো, আলাপ করিয়ে দিইনি। ইনি টিনা মুরহেড। সাংবাদিক। আর ইনি—।' পামেলা যে ভাষায় আমার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলেন তাতে আমারই লজ্জা লাগল। আমি একজন গল্পকার শোনামাত্র কানাডায় ভিসা দিতে দেরি করেননি অফিসার। সত্যি কথা বলতে কী, পামেলা এই প্রথম চর্মচক্ষে কোনও গল্পকারকে দেখলেন।

টিনা বললেন, 'আমিও এই প্রথম কোনও ক্রিয়েটিভ লেখককে দেখলাম।'

বললাম, 'একি কথা, আপনি সাংবাদিক, কাগজে লেখেন—।'

'না। আমি কাগজে লিখিনি কখনও, আমি ইনটারনেট ম্যাগাজিন রিপোর্টিং করি। ফ্রি ল্যান্স।'

কথা হচ্ছিল টুকটাক। এই দুই মহিলা এখন শীতবস্ত্র ছাড়াই বেশ সপ্রতিভ। টিনার জামা আবার একটু বেশি খোলামেলা। টিনা ভারতবর্ষের কথা জানতে চাইল। সেখানে কতগুলো ভাষা, সব ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি হয় কিনা, কত বই বের হয়, ইত্যাদি। ইন্টারনেট ম্যাগাজিন ভারতবর্ষে কত জনপ্রিয় জানতে চাইলেন তিনি। আমার উত্তর তাঁকে একটু হতাশ করল।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। পামেলা বললেন, 'আমাকে একটু অফিসে যেতে হবে। একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।'

টিনা বললেন, 'চলুন ওপরে যাই। আপনি সঙ্গে থাকলে ভাল থাকব।'

পামেলা হেসে ফেললেন শব্দ করে। আমি তাঁর দিকে তাকাতে তিনি বললেন, 'টিনা একা যাচ্ছে তো, ইতিমধ্যেই দুজন বৃদ্ধ ওকে সঙ্গ দিতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। আপনি সঙ্গে থাকলে ওর সুবিধে হয়।'

এটা শুনে আমার কৌতূহল হল।

ক্যাসিনোরুমটি বেশ বড়। স্লট মেশিন, তাসের জুয়া থেকে যাবতীয় খেলা যা লস ভেগাসের জুয়োঘরে থাকে তার মিনি সংস্করণ এটি। সুদৃশ্য, দামি পোশাক পরে নারীপুরুষেরা সেই জুয়ো খেলায় অংশ নিয়েছেন। দেখে কে বলবে বাইরে মাইনাস ডিগ্রি। টিনা জিজ্ঞেস করলেন, 'জুয়ো খেলবেন?'

হেসে বললাম, 'নষ্ট করার মত ডলার পকেটে নেই।'

'নষ্ট কেন বলছেন? পকেট ভরেও তো যেতে পারে।'

'আমার জুয়োয় লাক খুব খারাপ।'

টিনা হাসলেন, 'যার কার্ড লাক খারাপ তার নাকি ভাল হয়।'

এই সময় দুজন বৃদ্ধ হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল। দুজনেরই বয়স সত্তরের ওপরে। একজন বলল, 'তুমি কোথায় ছিলে? বল, তোমার জন্যে কী করতে পারি।'

'অনেক ধন্যবাদ। আপনারা চিন্তা করবেন না, আমি আমার অনেক পুরনো এই বন্ধুকে পেয়ে গেছি। ওঁর মত ভাল সঙ্গী আমি এখানে পেতাম না।'

টিনার কথা শোনামাত্র বৃদ্ধদের মুখের চেহারা বদলে গেল। টিনা আমাকে নিয়ে চলে এলেন স্লট মেশিনের সামনে। পাঁচ ডলার ভাঙিয়ে পাঁচটা টোকেন পাওয়া গেল। এক একটা টোকেন মেশিনের গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে হাতল ধরে টানতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের তিনটি চাকতি ঘুরবে। ঘুরে যখন স্থির হবে তখন যদি পাশাপাশি তিনটে চাকতির ছবি এক হয় তাহলে দশ থেকে একহাজার গুণ ডলার পাওয়া যাবে।

আমার কপালে যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হল। পাঁচবারে পাঁচটি টোকেন বেরিয়ে গেল কিন্তু পাশাপাশি তিনটে দূরের কথা, দুটো চাকতির ছবি এক হল না। টিনা আমাকে আরও পাঁচবার হাতল টানতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। পাঁচ ডলার গিয়েছে, ওটাকে দশ ডলার করতে চাই না। টিনা পাঁচ ডলার ভাঙিয়ে টোকেন নিলেন। প্রথমবার টোকেন ফেলে টানতেই ঝনঝন আওয়াজ উঠল, মেশিনের ওপরের লাল আলোটা জ্বলে উঠল। সেই প্রবল শব্দে চারপাশের মানুষ ফিরে তাকিয়ে উল্লসিত আওয়াজ তুললেন। টিনা এক হাজার ডলার পেল।

টোকেন থেকে নোটে চেঞ্জ করে নিয়ে টিনা বললেন, 'এটা আপনার প্রাপ্য ছিল। আপনি যদি আর একবার টানতেন তাহলে আপনিই পেতেন।'

আমি হাসলাম, 'প্রত্যেককেই তো একসময় শেষ করতে হয়। আমার আফসোস নেই।'

ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে আমরা চলে এলাম গ্লাস ঘরে। জাহাজের ছাদের ওপর এই গ্লাস ঘর। কোন আলো জ্বলছে না সেখানে। চারপাশ এবং ছাদ কাচের। এখন আকাশে তারা জ্বলছে। এত স্পষ্ট পরিষ্কার চেহারা তারাদের

কখনও দেখিনি। সমুদ্রের ওপর হালকা অন্ধকার। জলের রঙ কালচে, উত্তর মেরু এখান থেকে বেশি দূরে নয়। গ্লাসঘরের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় বসে দেখলাম সমুদ্রের জলে মাঝে মাঝে কিছু ভেসে যাচ্ছে। জাহাজের সার্চ লাইটের আলো যখন জ্বলে উঠল তখন বুঝলাম ওগুলো বড় বড় বরফের চাঁই। দেখেই শীত করল। এখন চারপাশে হিমবাতাস, শীত এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে আকাশের তলায় দাঁড়ালেই সাধারণ শীতবস্ত্র পরা মানুষ মরে যাবে। গ্লাসঘরের উষ্ণতায় দাঁড়িয়ে মনে হল, হঠাৎ যদি জাহাজের বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলে কী হবে! টিনাকে কথাটা বলতেই ওঁর হাত আমার হাত আঁকড়ে ধরল। বললেন, 'চলুন, নেমে যাই।'

টিনার কেবিন নাম্বার ছাব্বিশ। আমার থেকে বেশ দূরত্বে। ওঁকে কেবিনে পৌঁছে দিয়ে চলে এলাম। এসে দেখি আমার কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। চাবি ঘোরালাম কিন্তু খুলল না। দরজায় শব্দ করলাম। এবার দরজা খুলল। একজন তরুণ এবং একটি মাধ্যবয়সী মহিলা আমার কেবিনে দাঁড়িয়ে অথচ আমি নাম্বার ভুল করিনি। আমার সুটকেশটাকেও দেখতে পাচ্ছি।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'এটা বোধহয় আপনার কেবিন!'

'হ্যাঁ।'

'আসলে আমার কেবিন থেকে সমুদ্র ভাল করে দেখা যায় না বলে আমরা এখানে এসেছিলাম। অসুবিধে করার জন্যে দুঃখিত।' বলে তিনি বেরিয়ে এলেন তরুণকে সঙ্গে নিয়ে তরুণের গালে লিপস্টিকের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এসে মানুষের মনে প্রেম জেগেছে এবং সেটা যে গোপন তাতে সন্দেহ নেই।

পরের দিন ব্রেকফাস্টের সময় ভদ্রমহিলাকে দেখলাম এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। তরুণটি ধারে কাছে নেই। বুঝলাম ব্যাপারটা। ওঁর উদাসীন মুখ বড় নির্মম।

এই ভ্রমণ কাহিনী অসমাপ্ত। ইতিহাস বলছে মেরুর কাছাকাছি পৌঁছে অনেক জাহাজ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে বহুবার। কখনও জাহাজের সঙ্গে হিমবাহের সংঘাতে, কখনও আকস্মিকভাবে বৈদ্যুতিকযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ায় এরকম দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। সেরকম কিছু যে হয়নি, কলম্বাস জাহাজ ঠিকঠাক ঘুরে এসেছিল এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

সাহাবুদ্দিন চেয়েছিলেন আমাকে ওই ভ্রমণে পাঠাবেন। রাতে রেস্টুরেন্টে অধ্যাপক গুপ্তার মুখে ব্যাপারটা শোনার পর উনি খুব চেষ্টা করেন একটা টিকিটের জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আমার আর যাওয়া হয়নি।

কয়েকমাস আগে অধ্যাপক গুপ্তার কাছ থেকে চিঠিতে এই ভ্রমণের বিশদ বিবরণ পেলম। পেয়ে মনে হল সাহাবুদ্দিন টিকিট পেলে আমি যেতাম এবং গেলে কী হত। এই কাল্পনিক ভ্রমণ সঙ্গতকারণে শেষ করা উচিত নয়। কারণ আমরা যে স্বপ্ন দেখি তা কখনই নিয়ম মেনে শেষ হয় না।

এবার সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছি। খবরটা পেয়ে আব্দুর রহমান ফোনে জানিয়েছেন তিনি আমার জন্যে আগাম ওই ভ্রমণের টিকিট কেটে রাখবেন। সেপ্টেম্বরের কুড়ি তারিখে যাত্রা শুরু।

শুধু আব্দুর রহমান আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, কানাডায় ঢোকার ভিসা যেন আমি এখান থেকেই করিয়ে নিয়ে যাই। লেখকদের কোনও গুণই বাস্তবে মাপ করা হয় না।

২
দেখা মানুষের মুখ

আগে ভাগে টিকিট কেটে বেড়াতে গিয়ে অনেক জায়গা যাঁরা দেখতে চান তাঁদের সঙ্গে কাননবাবুর একটুও মেলে না। প্রতিবছর তিনি বাইরে যান। যাওয়ার আগে অন্তত তিনজন সঙ্গী জোগাড় করেন, এয়ারপোর্ট বা স্টেশন থেকে সোজা হোটেল বা গেস্ট হাউসে ঢোকেন। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে ঢুকে জামা-প্যান্ট ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে তাস খেলতে বসে যান ওঁরা। সকালবেলা হলে সঙ্গে বিয়ার চলে, তারপর ভদকা। দুপুরে এক ঘণ্টার মধ্যে স্নান খাওয়া সেরে আবার তাসে বসা। সন্ধের পর হুইস্কি এবং তাস। ডিনার এগারোটায়।

প্রায় প্রতিবারই সঙ্গী বদলে যায় কাননবাবুর। বোধ হয় তারা অস্বস্তিতে পড়েন। মুম্বাই বেড়াতে গিয়ে কি দেখলে তার জবাব দিতে পারেন না। সাতদিন শেষ হলে আবার সরাসরি এয়ারপোর্ট বা স্টেশনে ফিরে কলকাতায় চলে আসেন যাঁরা তাঁদের পক্ষে যাতায়াতের পথে যেটুকু দেখা যায় তার চেয়ে বেশি শহর সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। অথচ জিজ্ঞাসা করুন, কাননবাবু বলবেন, 'এ বছর একটু দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

আবার এর উল্টোটাও দেখেছি। নতুন জায়গায়-এসে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অনেকেই ছুটে বেড়ান। বালি খুঁড়ে জল বের করার মত দ্রষ্টব্য জিনিস দ্যাখেন। যিনি কখনও আকাদেমির আর্ট গ্যালারিতে ঢোকেননি, প্যারিসে গিয়ে ল্যুভরে না গেলে তার চলে না। মোনাসিলার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মুখ বেঁকে যায় তাঁর, 'দূর! এটা আবার ছবি নাকি!' আইফেল টাওয়ারে উঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেন পঞ্চাশ ফ্রাঁ খরচ করে। বেরিয়ে এসে বলেন, 'দারুণ টয়লেট।' আইফেল টাওয়ার নিয়ে একটিও কথা নয়।

আমার বেড়ানোর মধ্যে এই দু-দলের কোনও প্রভাব পড়েনি। প্যারিসে গিয়ে যেমন ঘরে বসে তাস খেলতে আমি পারব না, তেমনই একমাত্র ভেনাসের মূর্তির সামনে দাঁড়ানো ছাড়া ল্যুভরে ঢোকার খুব প্রয়োজন আমি বোধ করব না। আমার ভাল লাগবে কোনও সাধারণ পাড়ার কাফেতে বসে সময় কাটাতে। দরকার হলে অফবেট সেন্টারে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসতে। অচেনা-অজানা লোকজনের সঙ্গে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে জম্পেশ করে বসতে। কত কথা জানা যায় না, আমি জানি না। কত ঘটনার সঙ্গে জড়ানো যা যা কোনওদিন

জানতেও পারব না। একটি বিদেশি মানুষকে জানতে পারা আমার কাছে মাদাম ত্রুশোর মোমের মূর্তি দেখার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। তবে তার জন্যে আমার সময় দরকার, ফেরার টান কম না হলে এই আবিষ্কার সম্ভব নয়। আজ হিসাব করলে দেখছি, বিদেশে গিয়ে আমি পুরুষ মানুষকে যতটা দেখেছি মহিলাদের দেখেছি বিস্তর। এবং জেনেছি পৃথিবীর সব মহিলাই শেষ পর্যন্ত একই বিন্দুতে অবস্থান করেন, তিনি নারী।

এই সব কাহিনি লেখার সময় মনে হল, দ্বিতীয়বার না লেখা হয়ে যায়। তারপরে ভাবলাম, সকালে যে সূর্যকে দেখেছি, মধ্যাহ্নে সে অন্যরকম, বিকেলে আর একরকম। ঘুরে এসে টাটকা যাদের কথা লিখেছি, এতকাল তারা আমার মনে বাস করায় নিশ্চয় অন্যরকম চেহারা নিয়েছে। মানুষের বয়স বাড়ে, দেখা চরিত্র যখন স্মৃতিতে চলে যায় সেও তো ক্রমশ অন্য চেহারায় পৌঁছে যায়।

বাংলাদেশে প্রথম গিয়েছিলাম সাতাশি সালে। একটা সমস্যা হয়, কারও সঙ্গে কোথাও গেলে সে যা দেখায় তাই দেখতে হয়। তার বৃত্তের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় বেশি।

সেবার উঠেছিলাম বনানীর একটি বাড়িতে। অভিজাত বাড়ি। গৃহকর্তা নেই। ছেলেদের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মতানৈক্য চলছে। আমি যার সঙ্গে গিয়েছিলাম সে থাকে বিদেশে। তার কথাবার্তায় অন্য ভাইরা বা তাদের মা বিরক্ত। কিন্তু আমার সঙ্গে দিব্যি ভাল সম্পর্ক হয়ে গেল তাঁদের। উল্টে তাঁরাই আমাকে বললেন, বন্ধুকে বোঝাতে, একটু বাস্তবে ফেরাতে। সেটা করতে গিয়ে সে ক্ষেপে গেল আমার উপর। তখন সে বিবাহবিচ্ছিন্ন। কিন্তু দেখলাম অনেক পরিবারেই তার স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। মহিলারা তাকে বেশ পছন্দ করেন। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় সে আমাকে জোর করে নিয়ে যেত এক একটি পরিবারে। লক্ষ্য করলাম, ওই সব পরিবারের মহিলারা তাঁদের স্বামী সম্পর্কে মোটেই প্রীত নন। তাঁরা

বন্ধুর কাছে নালিশ করেন আর সে তাঁদের উপদেশ দেয় শান্ত হতে, মানিয়ে চলতে।

এক সন্ধ্যায় সে যার কাছে নিয়ে গেল তিন থাকতেন একা। বন্ধু কথা বলার সময় কোনও তথাকথিত ভদ্রতায় নিজেকে আড়াল করতেন না। বললেন, 'এই হল সমরেশ, রাইটার। আর এ হচ্ছে খুকু। খুকু একা থাকে। ও যার সঙ্গে প্রেম করত সে ওর পেটে বাচ্চা এনে দিয়ে কেটে পড়ার তাল করছে।'

চমকে উঠলাম। কোনও মহিলার সামনে বসে এ রকম কথা শুনব, ভাবিনি। বন্ধু বলল, 'আমি লোকটাকে ধরব ভাবছি, কিন্তু সে নাকি ঢাকার বাইরে।'

খুকু বললেন, 'ওই হারামজাদার নাম আমার সামনে করবে না।'

'কেন করবে না? সে তোমাকে ফাঁসিয়েছে, তাকে দায়িত্ব নিতে হবে।'

'ইস্। দায়িত্ব নিতে চাইলেই আমি দেব নাকি? যে মজা লুটে কেটে পড়েছে, তার কাছে আমি হাত পাতব? আমি কি খানকি?'

শব্দটা খটাং করে কানে লাগল। বন্ধু হেসে উঠল, 'এই সব শব্দ আগে বলতে না।'

'তোমরাই আমাকে বলতে বাধ্য করেছ। তোমাদের পুরুষ জাতটা হল শয়তানের দল। হাড়ে হাড়ে চেনা হয়ে গিয়েছে আমার।' মুখ বেঁকালেন খুকু।

আমি আর না পেরে বললাম, 'একটু বেশি গালাগালি দিচ্ছেন।'

'না দাদা। সত্যি বলছি। এই আমি, আমার মায়ের সঙ্গে একা থাকি, টাকা-পয়সার অভাব নেই, ভাল বাসলাম। সে শোওয়ার সময় বলল বিয়ে করবে। তার পর কেটে পড়ল। কি? না, দেশে একটা বউ আছে। সে লিখিত অনুমতি দেবে না। কথাটা শোওয়ার সময় মনে ছিল না হারামিটার? পেটের বাচ্চাটা এত বড় হয়ে গিয়েছে পেট কেটে বাদ দেওয়া যায়। অ্যাবরশন হয় না। তাই বাসায় একাই থাকি। সেটা জানাজানি হতেই অনেকের লালা গড়াতে লাগল। আমার কাছে এসে মিউমিউ করে। ধান্দাটা আমি বুঝি না? পেটে বাচ্চা থাকলেও ওদের কিছু আসে যায় না। এখন শোওয়া সেফ ব্যাপার। ওরা বাপ হবে না। এরপরে বলবেন আমি বেশি গালি দিচ্ছি?' খুকু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন।

জবাব দিতে পারিনি। চুপচাপ বন্ধুর সাথে বেরিয়ে এসেছি। সে অবশ্য কিছুক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, খুকু নাকি শোকে এ রকম হয়ে গিয়েছে। ওকে যেন ভুল না বুঝি।

বুঝিনি। কিন্তু যখনই শুনতাম কেউ কোনও মেয়েকে প্রতারণা করেছে তখনই মহিলার মুখ মনে আসত। আচ্ছা, মেয়েরা কি প্রেমে পড়ার পরই খুকু যে ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে, সেই ভাষায় কথা বলত? তা হলে প্রতারকরা নিশ্চয়ই এগোতে সাহস পেত না। ওরা বেশি নরম হয়ে যায়, হয়ে গিয়ে আত্মবিশ্বাস হারায় বলেই বিপদে পড়ে।

সবাই জানেন, খিস্তিখেউড় ছেলেরাই করে। শালা শব্দটি এখন অর্থহীন, গালাগালি বলে মনে করে না কেউ। চার অক্ষরের শব্দটি এখন কথার অঙ্গ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছেলেরা অবলীলায় বলে যায়। দু-অক্ষরের পুরুষ ইন্দ্রিয় চেঁচিয়ে বলতেও বাধা নেই, এখন নতুন নতুন অশ্লীল কথা বেরুচ্ছে, তাতে যত বেশি দুর্গন্ধ, তত বলে আনন্দ পায় পুরুষেরা। আমার পাড়ার রকে দশ থেকে পঁচাশি বছরের পুরুষরা আড্ডায় বসলেই বিভিন্ন শব্দের ঢেউ বইয়ে দেয়, যেগুলি কানে ঢুকলে না-শোনার ভান করি। মেয়েরা কি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেন। পাড়ার একটি বস্তিতে থাকেন এমন বৃদ্ধা রাস্তায় এলেই ছেলেরা অকারণ আওয়াজ দেয়। ওরা জানে সেটা দিলেই বৃদ্ধা খেপে গিয়ে নোংরা অশ্লীল গালাগাল করবেন। শুনতে মজা লাগে তাদের। এখন প্রশ্ন হল, বৃদ্ধা কোথায় অত অশ্লীল শব্দ শিখলেন? একজন নারী-বিশেষজ্ঞ জানালেন, আমার কোনও ধারণাই নেই। বান্ধবীরা একত্রিত হলে প্রচুর অশ্লীল শব্দ বিনিময় করেন। সেগুলি ছেলেদের চেয়ে কম জোরালো নয়। কিন্তু ওঁরা জানেন, কখন বলতে হবে বা যা ছেলেরা জানে না। কি জানি!

সেই যাত্রায় লায়লার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওই বন্ধুটির সৌজন্যে। স্বামী সরকারি চাকরি করেন, ভাল মানুষ। লায়লার হবি হল, কোথায় কোন বান্ধবী বিপদে পড়েছে, শোনামাত্র তাঁর উপকার করা। কারও স্বামী অকারণে স্ত্রীকে সন্দেহ করে গালিগালাজ করেছে, লায়লা ছুটে যাবেন তাঁদের বাড়িতে। স্বামীটিকে বোঝাবেন, না বুঝলে চোখ রাঙাবেন, এ রকম করলে পঞ্চাশ জন মহিলাকে নিয়ে স্বামীটির কাজের জায়গায় হাজির হয়ে ওর বিরুদ্ধে প্রচার চালাবেন। কোনও পরিচিত মেয়ে প্রেমে পড়েছে শুনলেই গিয়ে পাকড়াও করেন কলেজে পড়া মেয়েটির প্রেমিককে, যে তখনও বেকার। শর্ত দেন প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে জমা দিতে হবে তাকে। এক বছর পার হলে তিনি যেমন করে হোক ওদের বিয়ে দেবেন। এবং এই একবছর দেখাশোনা করা চলবে না।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শর্ত শোনামাত্র ছেলেটি সরে পড়ার চেষ্টা করে।

লায়লাকে বললাম, 'এ ক্ষেত্রে মেয়েটি কিছু বলে না।'

'ন্যাকা কান্না কাঁদে। ও অত টাকা কোথায় পাবে? আমি বলি তোকে বিয়ে করে সুখে রাখতে হলে ওকে রোজগার করতে হবে। নইলে তো বিয়ের পর শ্বশুরের ঘাড়ে পড়ে থাকবি। তাতে তোর আনন্দ হবে?'

এই লায়লা, তার স্বামী আর আমি একদিন পুরনো ঢাকায় গিয়েছিলাম। ছোট রাস্তা, তাতে সাইকেল রিকশার জ্বালাতন, গাড়ি চলাচল খুব ধীরে। আমি ছিলাম ড্রাইভারের পাশে। হঠাৎ পিছনে বসা লায়লার চিৎকার কানে এল, 'এই যে ও মৌলবী ভাই, একটু এদিকে আসবেন? কথা আছে।'

দেখলাম, রাস্তার পাশে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাড়িওয়ালা একজন মৌলবী যাঁর পরনে প্রায় পা-ঢাকা আলখাল্লা, গম্ভীর মুখে একজনকে কিছু জ্ঞান দিচ্ছিলেন। ডাক শুনে সুন্দরী মহিলা দেখে মুখে হাসি ফুটল। সেই হাসি মুখে সেঁটে এগিয়ে এলেন গাড়ির পাশে, 'বলেন আপা!'

আলখাল্লাটাকে দেখিয়ে লায়লা বললেন, 'এটা খোলেন না, খুলে কোনও দর্জিকে দ্যান। তিন-চারটা জামা হইয়া যাইব। চারজন গরিব মানুষের উপকারে লাগে।'

শোনামাত্র মৌলবী থ। গম্ভীর হয়ে ফিরে গেলেন ফুটপাতে। আমি বিস্মিত। লায়লাকে বলেছিলাম খুকুর কথা। শুনে সে মাথা নেড়েছিল, না।

'আপনি খুকুর পাশে দাঁড়াতে চাইছেন না?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'না। যে মেয়ে বিয়ের আগে ফুর্তির জন্য মা হয়ে যায়, তার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারে। যার সঙ্গে আনন্দ করেছিল তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়নি কেন? ও তো বাচ্চা মেয়ে নয়। এখন গোটা পুরুষ জাতটাকে গালি দিয়ে কি লাভ!'

দ্বিতীয়বার যখন ঢাকায় গেলাম, তখন বন্ধুটি বিদেশে। ছিলাম ঢাকা ক্লাবে। অভিজাতদের বিলাসকেন্দ্র। রাজুভাই তখন আওয়ামি লিগের এমপি। ক্ষমতায় তখন বেগম জিয়া। বিকেল হতে না হতেই আমার ঘরে আড্ডা দিতে চলে আসতেন যাঁরা, তাঁদের অনেকেই পরে মন্ত্রী বা অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন। রাত বারোটা পর্যন্ত চলত আড্ডা। ওঁরা চলে গেলে আবিষ্কার করতাম খাবার নেই। ক্লাবের কিচেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওই আড্ডায় যখন এক রাতে জমেছি, তখন তসলিমা এসেছিলেন দেখা করতে। সেই কাহিনি এখন থাক।

রাজু ভাই-এর স্ত্রী কল্পনা একদিন বলল, 'চলুন, নেত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

শেখ হাসিনা তখন বিরোধী নেত্রী এবং আওয়ামি লিগের প্রধান। গেলাম। এমন ভাবে আপ্যায়িত হলাম যেন অনেক দিনের পরিচিত। বোনকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে বললেন, 'নে, লেখক হাজির, প্রশ্ন কর।'

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি পত্রিকার পাতায় ধারাবাহিক লেখার সময় দীপাবলিকে একা রেখেছিলেন, স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়েছিল সে। কিন্তু বই বেরলে দেখলাম, ওরা এক হয়েছে। দু জায়গায় দুরকম কেন?'

আমার তরফ থেকে যা বলার বললাম।

শেখ হাসিনা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার মানে আপনি মনে করেন পাশে পুরুষ না থাকলে মেয়েদের জীবন চলে না?'

বললাম, 'না। কোনও পুরুষের প্রতি ভালবাসা থাকলে যতই বিরোধ বাড়ুক, মনের দুর্বলতা চলে যায় না।'

তিনি বললেন, 'সম্পর্কটা তো কাঁচের গ্লাসের মত, একবার ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে না। তাই না?'

'কতটা ভেঙেছে তার উপর নির্ভর করছে। শুধু দু-টুকরো হলে ভাল আঠা

দিয়ে জোড়া লাগানো যায়।' বললাম।

হাসলেন তিনি, 'সেই গ্লাস কি ব্যবহার করা যায়?'

'না। তবে আলমারিতে তুলে রাখা যায়। সম্পর্কটাকেও ওই ভাবে জোড়া দিয়ে দুটি নারী-পুরুষ একত্রে থাকতে পারে, যে যার মত। হয়ত এমন দিন আসবে, আঠা এমন শক্ত হয়ে যাবে যে ব্যবহার করলে আর খুলে পড়বে না।'

সেই প্রথম একজন প্রধানমন্ত্রী হওয়া বা হতে যাওয়া মানুষের সঙ্গে আলাপ আমার, যিনি বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত মনযোগী পাঠক।

আমার সঙ্গে উনি খুব ভাল ব্যবহার করেছেন—খবরটা প্রচার করল পরের দিনের সংবাদপত্রগুলি। সমরেশ ঢাকায় এসেছেন, ঢাকা ক্লাবে উঠেছেন, লোকে কাগজ পড়ে জানল। রাত্রে আড্ডার পর রিকশা নিয়ে খাবার ঘরে খেতে গিয়েছি। এই রেস্টুরেন্টটি সারারাত খোলা থাকে। রাত একটাতেও সন্ধ্যেবেলার ভিড়। চেয়ারে বসার পর এক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'সেলাম আলিকুম। আপনাকে একটু বিরক্ত করতে পারি?'

পোশাক বেশ সম্ভ্রান্ত মনে হওয়ায় বললাম, 'বলুন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি সিরাজ, ঢাকা পুলিশের ডিএসপি।'

অবাক হলাম, 'আমি কি কোনও অন্যায় করেছি।'

'কি যে বলেন! একটু যদি উপকার করেন।'

'আমি আপনার উপকার করব?'

'হ্যাঁ। সামনের মাসেই নির্বাচন। আমার কাছে খবর আছে, এবারে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসবে। তা হলে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবেন।'

আমি চুপ করে থাকলাম।

'বর্তমান সরকার আমাকে অন্যায়ভাবে সাসপেন্ড করে রেখেছে। আমাকে কোনও কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে না। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে তাঁকে যদি আমার কথা বলেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন লেখককে উপেক্ষা করবেন না।'

'আপনাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে কেন?'

'কবিতা লিখি বলে। বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া অন্য কোনও কারণ নেই।'

'কিন্তু নির্বাচনের ফল কি হবে তা কি আগাম জানা যায়? তা ছাড়া যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, তাঁদের তো অনেক সুদিন। কোনও কাগজ তো বলছে না, তারা ক্ষমতাচ্যুত হবেন। আর সত্যি যদি আপনি যা বলছেন তাই হয় তা হলে তো সে সময় আমি এ দেশে থাকব না।'

'টেলিফোন করলেই হয়ে যাবে। একটু মনে রাখবেন।' পকেট থেকে তাঁর কার্ড বের করে আমার হাতে দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল তার পরের দিন সকালে। অপারেটর জানাল, 'স্যার, আপনার টেলিফোন।'

একটু পরেই মহিলার গলায় শুনলাম, 'সমরেশ মজুমদার?'

'বলছি।'

'দাদা, আমাকে আপনার মনে রাখার কারণ নেই। আমি খুকু।'

'খুকু?' আমি চট করে ঠাহর করতে পারলাম না।

'আমার বাসায় আপনি একবার এসেছিলেন।'

এবার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

'কালকের পত্রিকায় দেখলাম আপনি ঢাকায় এসেছেন, ঢাকা ক্লাবে উঠেছেন। তাই সাহস করে ফোন করলাম।'

'বেশ তো। এখন কেমন আছেন?'

'ভাল, আমার ছেলে এখন স্কুলে যাচ্ছে।'

'বাঃ।'

'ও যখন পেটে ছিল তখন আপনার সঙ্গে পরিচয়।'

'আচ্ছা!'

'আমি এখন ম্যারেড।'

'তাই? শুনে খুশি হলাম। সেই ছেলেটি কি—?'

'না দাদা। ইনি জাহাজে চাকরি করেন। ক্যাপ্টেন। অনেক বড় মনের মানুষ। আলাপ হওয়ার তিনদিন পরে ফোনে বিয়ের প্রস্তাব দেন। বলেন, আমি যদি রাজি হই, তা হলে আমার ভাবী সন্তানকে উনি পুত্র হিসাবে গ্রহণ করবেন।'

'তা হলে সব পুরুষই খারাপ নয়, তাই না?'

'না। তবে যখন চোখের সামনে অন্ধকার দেখছিলাম, তখন ওই কথাই মনে হত। ইনি আলো দেখালেন। একটা কথা বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'সেদিন আপনার সামনে যে সব খারাপ কথা বলেছিলাম তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। করবেন তো? আর পারেন যদি আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবেন। আচ্ছা রাখি।' সে হঠাৎই ফোন রেখে দিল।

বাংলাদেশের মানুষ যতটা না খেতে ভালবাসেন খাওয়াতে ভালবাসেন তার চেয়ে ঢের বেশি। পৃথিবীর সর্বত্র, যেখানেই গিয়েছি, এর প্রমাণ পেয়েছি। খাবার টেবিলের একটা দিকে ভরে থাকত নানান উপাদেয় তরকারি বা মাছ-মাংসে। পরিমাণ দেখে আঁতকে উঠতাম। কিন্তু ভর বিকেলে কোনও অতিথি এলে গৃহকর্ত্রী তাঁকে স্বচ্ছন্দে ভাত খেতে বললে তিনি যখন সহাস্যে খাবার টেবিলে বসতেন তখন বুঝতাম ভদ্রমহিলার দূরদর্শিতা।

ঢাকাতেও এই একই জিনিস দেখেছি। খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে আসা অতিথিকে এঁরা ভাত খাইয়ে তবে ছাড়েন। পশ্চিমবাংলায় আমরা এটা ভাবতেও পারি না। কিন্তু এর বিপরীত অভিজ্ঞতাও হয়েছিল।

ঢাকা ক্লাবে এক ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন। বেশি কথা বলতেন না, আড্ডায় পিছন দিকেই থাকতেন। একদিন একটু আগে এসে আমায় প্রস্তাব দিলেন পরের দিন দুপুরে যদি ওঁর বাড়িতে আহার করি তা হলে বাড়ির সবাই খুশি হবেন। আমি দ্বিধা করছি দেখে বললেন, 'আমার তো বেশি কিছু করার সাধ্য নেই, সামান্য স্কুল মাস্টার, যা পারি তাই যদি গ্রহণ করেন তা হলে ধন্য হব।'

ধন্য শব্দটায় আপত্তি জানিয়ে রাজি হলাম। জানলাম আমার ঘরে যেসব খ্যাতিমান নেতারা আসেন, ইনি তাঁদের অনেকের সহপাঠী ছিলেন বলে আজও যোগাযোগ রয়েছে। ভালওবাসেন সবাই ওঁকে।

পরদিন দুপুরে ভদ্রলোক এসে আমায় নিয়ে গেলেন রিকশা করে। ঢাকার বেশির ভাগ বন্ধুরাই দু-তিনটি বিদেশি গাড়ির মালিক। রিকশায় উঠে মন্দ লাগল না। যে পাড়ায় আমরা গেলাম, সেটি মধ্যবিত্ত মানুষের বাস, বাড়ির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। সাদরে আমাকে বাইরের ঘরে বসালেন তিনি।

'দাদা, প্রথমে কি চা খাইবেন?'

'না না। চা খাব না। আপনার সন্তানরা কোথায়?'

'আছে। এই, এখানে আসো তোমরা।' ডাকামাত্র তিনটি বালক-বালিকা দরজায় এসে দাঁড়াল। তিনি আদেশ করলেন, 'নাম বল।' তারা নাম বলল। 'যাও, মারে বল, খাবার টেবিলে দিতে।'

'দিচ্ছে।' ছোটটি জানাল।

'অ। আসেন দাদা।' পর্দা সরিয়ে ভিতরে গেলেন তিনি। সামনেই উঠোন। উঠোনে ডুমুর গাছ। বারান্দায় পাতা টেবিলের দিকে তাকিয়ে আমি আঁতকে উঠলাম। এক, দুই, তিন, এগারো রকমের ভাজা থেকে ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস।

'এগুলো কি আমায় খেতে হবে?'

'এ এমন কিছু না।'

'আমি খেতে পারব না। আপনার স্ত্রীকে বলুন এর সিকিভাগ রাখতে।'

'তা হয় না দাদা। সেই ভোর থিকা সে আপনার জন্যে রাঁধছে। ঠিক আছে, যা পারেন খান, তবে ইলিশ মাছ আর কই মাছ খাইতেই হইব।'

খেতে বসলাম। অত্যন্ত সুস্বাদু রান্না। দেখলাম, সন্তানেরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। বেগুন ভাজা শেষ হওয়া মাত্র কানে এল, 'ব্যাগুন শেষ।'

কিছুক্ষণ বাদে আবার একজন বলল, 'কাঁচকি শেষ!'

ভদ্রলোকের কানে যাওয়াতে তিনি ধমক দিলেন, 'এ্যাই যাও, যাও।'

ওরা আড়ালে গেল। খাওয়া শেষ হল। সব পারলাম না। ওঁর স্ত্রী কিন্তু একবারও সামনে এলেন না। হয়ত পর্দানসীন। ভদ্রলোকের মুখে হাসি, 'রান্না কি রকম লাগল?'

'খুব ভাল।'

উনি আমাকে পৌঁছে দিতে আসছিলেন, আমি প্রতিবাদ করায় রাজি হলেন। সেই বিকেলে প্রথম এলেন মেনুভাই। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন খাইলেন?'

'দারুণ। রোজ এ রকম খেলে মরে যাব।' বললাম, 'প্রচুর খরচ করেছেন ভদ্রলোক।'

'একটা কথা কাউকে বলবেন না, ওরেও না।'

'বলব না।'

'কাল এক হাজার টাকা ধার নিয়ে বাজার করেছে। একজনের জন্যে যা যা লাগে তা কিনতেই প্রায় হাজার শেষ। আরে মিঞা, ঢাকায় এখন ইলিশের দাম সাড়ে চারশো, কই পাঁচশো।'

হঠাৎ শরীর গুলিয়ে উঠল, 'সে কি! আমি ছাড়া ওরা কেউ খায়নি?'

'এক হাজারে হয় না। স্কুল-মাস্টারের মাইনা কত আন্দাজ করেন!'

কী রকম অপরাধী বলে মনে হতে লাগল নিজেকে। ভদ্রলোক আর আড্ডায় আসেননি। আমাকে খাওয়াতে ধার করতে হয়েছিল ওঁকে। কি প্রয়োজন ছিল? এখনও চোখ বন্ধ করলে সেই দৃশ্যটি মাঝে মাঝে দেখতে পাই। তিনটি বাচ্চা উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার খাওয়া দেখছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে, 'বেগুন শেষ, কাঁচকি শেষ।' চলে আসার পর ওরা দৌড়ে আসবেই। এসে বলবে, 'ইলিশ দেড়খানা আছে, কই একখানা, মাংস অর্দ্ধেক!'

এ রকম অতিথি সৎকার বাংলাদেশের মানুষেরাই পারেন।

আমেরিকার দুটো শহর আমাকে খুব টানে। যদিও সেই চুরাশি সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় এগারোবার ও দেশে গিয়েছি এবং এখন বেশ একঘেয়ে লাগে। প্রতিটি শহরের (একমাত্র নিউইয়র্ক এবং স্যানফ্রানসিস্কো ছাড়া) নিজস্ব কোনও চরিত্র নেই। বাড়ি, রাস্তা, মানুষ সব একই ধাঁচের। রাস্তায় মানুষ নেই, গাড়ি ছুটছে দিনরাত। সবাই যন্ত্রের মত জীবনযাপন করে। নিউইয়র্কের রাস্তায় ভদ্রলোক, অভদ্রলোক, ছিনতাইবাজ, স্ট্রিটগার্ল থেকে গীটার বাজিয়ে গান গাওয়া ছোকরা-ছুকরিদের অদ্ভুত সহাবস্থান আছে।

ম্যানহাটনের দুটো রূপ। দিনের বেলায় ফুটপাতে গিজগিজ করছে লোক, দোকানে কেনাবেচা চলছে। বিকেল হতেই মানুষজন ছুটছে যার যার ডেরায়। সন্ধ্যের পর ম্যানহাটন আর আফ্রিকার জঙ্গলের কোনও পার্থক্য নেই। তখন হুকার মেয়েরা গলির মুখে এসে গতি কমানো গাড়ির দিকে অঙ্গভঙ্গি করে, পুলিশের গাড়ি দেখলে দৌড়ে পালায়। আর তামাম তল্লাটটা চলে যায় বিশাল চেহারার নিগ্রোদের দখলে। এই 'নিগ্রো' শব্দটা লিখতে একটু অস্বস্তি হল। বাল্যকালে আঙ্কল টমস কেবিন পড়ার পর এবং মার্টিন লুথার কিং-এর

আন্দোলনের খবর শুনে কালোদের সঙ্গে মনে মনে কাঁধ মিলিয়েছিলাম। সাদারা চিরদিন কালোদের ওপর অত্যাচার করেছে, শোষণ করেছে বলে কালোদের ভাল লাগত।

অল্প বয়সে ভাবতাম, আফ্রিকার কোনও কালো মেয়েকে বিয়ে করলে ভাল হয়। এই ভাবনার বদল হল উননব্বই সাল থেকে, সেবার প্রথম একটি কালো ছেলে আমার কাছে সিগারেট চেয়ে না পেয়ে ছিনিয়ে নিয়েছিল। সেই প্রথম ডোলের ডলারে ড্রাগ খাওয়া কালো মানুষদের দেখেছিলাম, ডলার ফুরিয়ে যেতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাঁচ ডলার ভিক্ষে চায় অম্লান বদনে, সন্ধ্যে নামলে বদলে যায় চেহারা। তখন ভিক্ষে নয়, গায়ের জোরে টাকা আদায় করে নিতে দেরি করে না।

ম্যানহাটনের পাশে, কুইনস, ব্রুকলিন তো জমজমাট জায়গা। হেঁটে ঘুরলে অনেককেই আড্ডা মারতে দেখা যায়।

কিন্তু লস ভেগাস আর অ্যাটলান্টিক সিটির ব্যাপারটাই আলাদা। লস অ্যাঞ্জেলস থেকে মরুভূমি ডিঙিয়ে লস ভেগাসের দশ মাইলের মধ্যে চলে এলে বাড়ির ওপর যে সব নিওন সাইন চোখে পড়ে তা রীতিমতো আকর্ষণীয়। আমরা একটি ক্যাসিনো শহরে ঢুকতে যাচ্ছি, তারই আমন্ত্রণ সেখানে। সন্ধ্যের পর মনে হবে এক স্বপ্নপুরীতে চলে এলাম। যেখানে ছিনতা, অভাব বলে কিছু নেই।

কিছুই ছিল না যেখানে, দিনরাত বালির ঝড় বয়ে যেত, সেখানে এক অত্যাশ্চর্য শহর তৈরি করেছে আমেরিকানরা, যেখানে কিছু মানুষ বড়লোক হতে যায়, বেশির ভাগ যায় সীমিত ডলারে মজা পেতে।

লস এঞ্জেলস থেকে গ্রে হাউন্ড বাসে চেপে ছিলাম লস ভেগাস যাব বলে। পথে যে ঘটনাটা ঘটল তার জের এখনও চলছে। খুব খিদে পেয়েছিল। দুপাশে মরুভূমির বালি ফুঁড়ে যে রাস্তা তার ওপর দিয়ে বাস চলছে বেশ দ্রুত গতিতে। ঘণ্টা দুয়েক যাওয়ার পর সেটা হাইওয়ে থেকে নেমে পনেরো মিনিটের জন্যে যেখানে থামল, সেখানে কফি-চায়ের দোকান আছে, আছে টয়লেট। তার পাশে মুদির দোকান। তবে মুদির দোকান নয়, একেবারে কেতাদুরস্ত আধুনিক দোকান। ভাবলাম একটা আপেল খেলে পেট ভরে যাবে। দোকানদারকে বলতে সে ফ্রিজ খুলে আপেল বের করে দিল। দাম দিয়ে তাতে কামড় দিলাম। কি আশ্চর্য। দাঁত বসছে না আপেলের শরীরে। কতদিন ওই ফ্রিজে ছিল জানি না, পাথরের চেয়ে শক্ত হয়ে রয়েছে, সেই সঙ্গে হিম ঠাণ্ডা। আমি আরও জোরে দাঁত বসাতেই মনে

হল ভূমিকম্প হল। আপেলের একটা চাকলা উঠে এল বটে, সেই সঙ্গে আমার উপরের পাটির দাঁতের ঠিক মাঝখানেরটা, যেটা মুখ খুললেই প্রথমে চোখে পড়ে, নড়ে উঠল। আঙুল দিয়ে স্পষ্ট টের পেলাম শক্ত দাঁতটার গোড়া আলগা হয়ে গিয়েছে। রেগে গিয়ে আপেলটাকে ছুঁড়ে ফেললাম মরুভূমির বালিতে। একটা ঝড়ো বাতাস কিছুটা বালি ওর ওপরে তুলে দিল। খিদের কথা ভুলে গেলাম। জিভ রক্তের স্বাদ পাচ্ছে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, কলকাতায় এসেই ডক্টর বারীন রায়ের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। দাঁতের ডাক্তারদের মত নিষ্ঠুর অন্য কোনও ডাক্তার হয় না। বারীনদা গম্ভীর মুখে পাঁচ মিনিট জ্ঞান দিলেন। বেশির ভাগ শিক্ষিত মানুষ দাঁতের ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ। কোনও কেয়ারই করে না। ফলে দাঁত পলকা হয়ে যায়। ইত্যাদি। দাঁত খারাপ হলে কি কি অসুখ হয় তার ফিরিস্তি শুনতে হল। চিঁচি করে বললাম, 'বারীনদা দাঁতটাকে বাঁচান।'

'তুলতেই হবে। তবে তোমার যখন ওটার ওপর এত মায়া তখন তুলে জুড়ে দেব।' বারীনদা বললেন। দাঁত তুলে আবার জোড়া যায় সেই প্রথম শুনলাম। সত্যি সত্যি জুড়ে দিয়েছিলেন তিনি। আমার দাঁত আবার শরীরে রয়েছে দেখে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু সেই খুশির আয়ু ছিল এক বছর।

ফিরে যাই মরুভূমিতে। বাস ছাড়ল। আমার তখন দাঁত ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা নেই। বারংবার জিভ চলে যাচ্ছে নড়বড়ে দাঁতের গোড়ায়। আর আমার একমাত্র প্রার্থনা, শরীর যেন দাঁতটাকে আবার আগের মত টাইট করে দেয়।

হঠাৎ চোখে পড়ল, ওয়েলকাম টু লস ভেগাস। তার পর বিভিন্ন ক্যাসিনোর বিজ্ঞাপন বালির ওপরে দাঁড়িয়ে। তখন দুপুর শেষ হয়েছে। লস ভেগাস শহরে বাস যেখানে নামাল সেখানে একটিও মানুষ নেই। মাটিতে নামতেই মনে হল জ্বলে যাব। গরমে হাত-পা-মাথা পুড়ছে। যাত্রীরা দৌড়ে রাস্তার ওপাশে সাজানো বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে দেখে আমিও অনুসরণ করলাম। কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই শীতল বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল।

কাচের দ্বিতীয় দেওয়ালের ওপাশে বিশাল, প্রায় ফুটবল মাঠের মত হলঘরে তখন আলোর ফোয়ারা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি স্লট মেশিনগুলি, রিসেপশনে যেতেই সুন্দরী মেক্সিকান মহিলা হেসে বললেন, 'আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

'একটি ঘর চাই।'

'নিশ্চয়ই। আপনি খুব ভাগ্যবান। সপ্তাহের একটি দিন আমরা রিডিউসড রেটে ঘর ভাড়া দিই। আজ সেই দিন। আপনার পাশপোর্টটা প্লিজ।'

জানলাম আমাকে প্রতিদিনের জন্য মাত্র পনেরো ডলার ঘর ভাড়া হিসেবে দিতে হবে। একটা সাদামাটা মোটেলের ঘরও পঁয়তাল্লিশ ডলারের নীচে পাওয়া যায় না। সঙ্গে পাওয়া গেল চেকবই-এর চারটে পাতা। দেখলাম এই ক্যাসিনোর রেস্তোরাঁতে দেখালে ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার বিনা পয়সায় খাওয়াবে আমাকে। সুন্দরী বললেন, 'যদি কালকে থাকেন, তা হলে আবার কুপন কালেক্ট করবেন।'

পনেরো ডলার দিয়ে লিফটে চেপে চারতলায় পৌঁছে নাম্বার মিলিয়ে কার্ড ঢুকিয়ে দরজা খুলে ঘরে পা দিলাম। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর, পায়ের তলায় কার্পেট, সুন্দর বিছানা, টিভি। টয়লেট খুলে দেখলাম বেশ ঝকঝকে। এ রকম ঘর আমি ছয়শো টাকায় কি কলকাতায় পেতাম? অবশ্যই না।

দুদিন ধরে জুয়ো খেলেছি এবং হেরেছি বা জিতেছি, সে গল্প এখানে নয়। লস ভেগাসে কেউ দিনের বেলায় ওই সময় বেরুতে পারে না গরমের জন্যে। রাত ৯টা বেজে যায় পৃথিবীটা ঠাণ্ডা হতে। তার পর সকাল পর্যন্ত রাস্তায় মানুষের চলাফেরা। এই শহর দিনে ঘুমায়, রাতে জাগে।

সারাদিন স্লট মেশিনের সামনে বসায় আঙুলগুলোয় শিরশিরানি এসেছিল।

রাত নটার পর বের হলাম। সারাদিন ধরে দেখেছি জুয়ো খেলছেন বিদেশি টুরিস্টরা, তাদের মধ্যে জাপানি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যাই বেশি। চার্টার্ড বাসে চেপে তাঁরা আসছেন। ভাল করে হাঁটতেও পারেন না বয়সের জন্যে। এসে মেশিনের সামনে টুলে বসে পড়ছেন। মেশিনগুলিতে এক, পাঁচ, দশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে খেলা যায়। আবার এক থেকে একশো ডলারও রয়েছে। ওই বুড়ো-বুড়িরা বসেন এক কি পাঁচ সেন্টের মেশিনে। সারাদিন ধরে খেললেও একশো ডলার হারবেন না এঁরা।

রাস্তায় বেরিয়ে যাদের দিকে বারংবার চোখ ঘুরল তারা অল্পবয়সী আমেরিকান। বেশিরভাগই মেয়ে। শর্টস এবং গেঞ্জি পরে স্কেটিং করছে ফুটপাতের পাশ ঘেঁষে। দুটো মেয়ে চুমু খেতে খেতে স্ট্যাচু হয়ে গিয়েছে। লক্ষ করলাম যে সব মেয়ে পুরুষদের সঙ্গী করেছে তাদের পছন্দ ছিপছিপে কালোদের।

একটার পর একটা ক্যাসিনো পেরিয়ে চলেছি। চারপাশে আলোর বাহার।

ক্যাসিনোয় নামের কি বাহার, সিজার, ট্র্যাম্প, তাজ। আগ্রার তাজমহলকে মনে রেখে তৈরি হয়েছে বিশাল ক্যাসিনো। চোখে পড়ল একটা হোর্ডিং। আপনি কি এক ঘণ্টার নোটিশে বিয়ে কিংবা ডিভোর্স করতে চান? তা হলে চলে আসুন ভিতরে। আপনাদের জন্য আমরা চব্বিশ ঘণ্টা জেগে থাকি। এক ঘণ্টার নোটিশে বিয়ে তো বুঝলাম, ডিভোর্স কি করে এক ঘণ্টায় হয়?

ঢুকে গেলাম ভিতরে। বাঁ দিকে লেখা রয়েছে 'ম্যারেজ সেল', ডানদিকে 'ডিভোর্স'। প্রথম কাউন্টারে বেশ ভিড়। দ্বিতীয়টিতেও পাঁচ-ছয় জন। তাদের ফর্ম ভর্তি করতে দেওয়া হয়েছে। সুন্দরী রিসেপশনিস্ট একগাল হেসে বললেন, 'ডিভোর্স চান? দুজনেই এসেছেন?'

'না। আমি খোঁজ নিতে এলাম।'

'ওয়েল। স্বামী-স্ত্রী যদি মিউচ্যুয়াল ডিভোর্স চায় তা হলে আমরা চার্জ করি পঞ্চাশ ডলার। আবেদন করলে আমরা যে সার্টিফিকেট দেব তা এখানে সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ। আপনার স্ত্রী যদি না আসেন, বা কারও স্বামী যদি না আসেন, তা হলে দিতে হবে একশো ডলার। সে ক্ষেত্রে আপনার স্ত্রী পৃথিবীর যেখানেই থাকুন, আমরা টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলে ডিভোর্সের কথা জানিয়ে দেব।' সুন্দরী হাসলেন।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই একজন প্রৌঢ় এগিয়ে এলেন, 'আপনি কি ডিভোর্স নিলেন?'

'না। কেন বলুন তো?'

'আমি জার্মান। থাকি বার্লিনে। আমার স্ত্রী জীবনটাকে নরক করে দিয়েছে, কিন্তু ডিভোর্স দিতে চাইছে না। দিলে ও যা টাকা চাইছে তা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। ভয়াবহ অবস্থা।' করুণ মুখে বললেন ভদ্রলোক।

'বাঃ। আপনি তো এখানে একশো ডলারেই ডিভোর্স পেতে পারেন।'

'পারি। কিন্তু এই আইন লস ভেগাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার মানে এখানে ডিভোর্স নিলে আমি কখনওই লস ভেগাসের বাইরে যেতে পারব না। গেলেই পুলিশ ধরবে। আমার স্ত্রী তো তাঁদের জানাবেই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। দু-চারদিন মজা করতে এখানে থাকা যায়, সারাজীবন কি করে থাকি বলুন তো?' ভদ্রলোক উদাস হয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট তাদের নিজের করা আইনে চলে। ওয়াশিংটন সরকার সেখানে নাক গলায় না। ডিফেন্স, অর্থ ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ছাড়া সব কিছুই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্টেটগুলির ওপর।

গ্রে হাউন্ড বাসে ঘুরতে ঘুরতে শুনেছি, ড্রাইভার বলছেন, 'আমরা এখন অমুক স্টেটে ঢুকছি। এই স্টেটে বাসে সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে কোনও আইন নেই। ধূমপায়ীরা খুশি হন, তবে দেখবেন পাশের যাত্রীর যেন কোনও অসুবিধে না হয়।'

কয়েক পা হাঁটতেই একটা পাব চোখে পড়ল। আমেরিকায় পাব খুব একটা চোখে পড়ে না। এখানে বারের ছড়াছড়ি। পাবলিক বার, সিঙ্গলস বার, ফ্যামিলি বার। বারের মাহাত্ম্য ইংল্যান্ড গেলে দেখা যায়।

ভিতরে ঢুকে দেখলাম এটি আয়তনে বেশ ছোট। চারজন টেবিলে বসে গুলতানি মারছে। কাউন্টারের এপাশে লম্বা টুলে বসে আছে যে তার বয়স হয়েছে। শরীর খুবই শীর্ণ, কিন্তু সাজগোজের বাহার আছে। আমি ওঁর পাশের টুলে বসে কাউন্টারের ওপাশের লোকটিকে বিয়ার দিতে বললাম।

পাশে-বসা রোগা প্রৌঢ় বলল, 'ভয়ংকর গরম পড়েছিল আজ। তাই না?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। অভিজ্ঞতায় জানি এ রকম জায়গায় মানুষ কথা বলার জন্য মুখিয়ে থাকে। তাদের কেউ ধান্দাবাজ কেউ গপ্পিয়ে।

'এই প্রথম এলে?'

'হ্যাঁ।'

'সেই লস ভেগাস এখন আর নেই। এখন সবই কমার্শিয়াল। কোন দেশ?'

'ইন্ডিয়া।'

'ও ইন্ডিয়া! ল্যান্ড অফ তাজমহল, ইন্দিরা গান্ধী। গুড গুড।' হাত বাড়াল লোকটি, মাই নেম ইজ এড। এডওয়ার্ড।'

'আমি সমরেশ।'

'স-ম-। ক্যান আই কল ইউ স্যাম?'

হেসে মাথা দোলালাম, 'বিয়ার চলবে?'

'কিছু মনে করব না।' বলে গলা তুলল, ' জিমি, এই ভদ্রলোক আমাকে একটা বিয়ার অফার করছেন, তুমি কি সেটা এনে দেবে?'

নির্লিপ্ত মুখে জিমি ওকে বিয়ার এনে দিল।

বোতল থেকে কিছুটা গলায় ঢেলে এড জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় উঠেছ?'

নাম বলতেই সে মাথা নাড়ল, গুড প্লেস।

'এখানে রাস্তাঘাটে ছিনতাই হয় না তো?'

'ছিনতাই? পাগল। এই শহর পুলিশ চালায় না। তারা আছে, থাকবে। ক্যাসিনোর মালিকরা ট্যুরিস্টদের গায়ে একটুও টাচ করতে দেবে না। বছর দুয়েক আগে একটা উটকো ছিনতাইবাজ এসেছিল। একজন জাপানি মহিলার ব্যাগ ছিনতাই করেছিল। তিনি পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে ছিনতাইবাজ গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। এখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। একা এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'বান্ধবী পাওনি এখনও।'

'চেষ্টা করিনি।'

'খুব সাবধান। কার কি অসুখ আছে কে জানে।' এড বলল।

'তুমি কি এখানেই থাক?'

'হ্যাঁ। সারাদিন ঘুমাই, আটটার পর এখানে এসে বসি।'

'সংসার?'

হাসল এড, 'চারবার বিয়ে করেছি, টেঁকেনি।'

'সেকি!'

এড আঙুলে কপাল বাজাল। ওর বিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল। আরও গল্পের আশায় জিমকে বললাম দুটো বিয়ার দিতে।

দ্বিতীয়টি গলায় ঢেলে এড বলল, 'ধন্যবাদ! আসলে কি জানো, আমার একটাও বিয়ে করা উচিত হয়নি। আমার স্বভাব হল কারও সঙ্গে দু-তিন বছর থাকলেই বিরক্ত হয়ে উঠি। এ রকম মানুষ স্বামী হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।'

'তোমার চলে কি করে? মানে, প্রফেশন কি?'

'আমি? আমি সিঙ্গার। রোজ রাত একটা থেকে চারটে পর্যন্ত সান সিঙ্ক ক্লাবে গান গাই।' এড হাসল।

'ক্লাবটায় সারারাত লোক থাকে?'

'থাকে মানে? জন্মদিনের পোশাকে মেয়েদের দেখায় বলে ভিড় উপচে পড়ে। যাবে নাকি? তিরিশ ডলার টিকিট, তুমি আমার গেস্ট বলে পনেরো ডলারে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।' এড বলল।

'আজ নয়। আর এক রাতে যাব।'

এই সময় পাবে ঢুকলেন যিনি তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে।

গায়ের রং জলপাই-এর মত। চিৎকার করলেন, 'হাই এড।'

এড ঘুরে তাকাল। হাসল, 'হাই ব্রিজিত।'

ব্রিজিত নামের মহিলা দৌড়ে এসে এডকে জড়িয়ে ধরে চকাস চকাস চকাস করে চারটে চুমু খেল, 'আই অ্যাম সো লাকি, তোমার দেখা পেলাম।'

চুম্বনমুক্ত হয়ে এড জিজ্ঞাসা করল, 'বহু বছর পরে দেখা হল। এবার তুমি কোত্থেকে এলে?'

'আলবারকুরকে।'

'আচ্ছা!' এড হাসল, 'তোমার বর্তমান স্বামী?'

'অতীত হয়ে গিয়েছে।'

'কোথায় উঠেছ এখানে এসে?'

'কোথাও না। বাস থেকে নেমে সোজা তোমার কাছে এলাম।'

ভদ্রমহিলাকে লক্ষ করছিলাম। এখনও ওর ফিগার বেশ আকর্ষণীয়। বুকের অনেকটাই উন্মুক্ত থাকায় চোখ বেশিক্ষণ রাখা যাচ্ছে না।

এড বলল, 'মিট মাই ফ্রেন্ড, স্যাম, হি ইজ ফ্রম ইন্ডিয়া।'

'ওঃ। গ্ল্যাড টু মিট ইউ। ব্রিজিট।' বুকে আঙুল ছোঁয়ালেন মহিলা। তারপরেই ঘুরে দাঁড়ালেন এডের দিকে, 'নাউ এড, প্রথমে আমাকে একটা থাকার জায়গা ঠিক করে দাও। তুমি নিশ্চয়ই আবার বিয়ে করেছ?'

'নাঃ। তবে আমার ঘরে জায়গা নেই।'

'তা হলে অন্য কোথাও।'

'কতদিন থাকবে?'

'কতদিন মানে? এখানেই থাকব। সানসিঙ্কে আমাকে ঢুকিয়ে দিতে পারবে?'

'সরি। ওখানে নতুন মেয়ে গাইছে, খুব ভাল।'

'তা হলে অন্য কোথাও?'

'চেষ্টা করতে পারি।'

'এড, তুমি বলেছিলে তোমার চারটে বউ-এর মধ্যে আমি সবচেয়ে ভাল। কি বলনি, তুমি? টেল মি?'

'হ্যাঁ। ঠিক তাই। স্যাম। ব্রিজিত আমার ফোর্থ ওয়াইফ ছিল। তখন খুব চমৎকার গাইতো। আমাকে সহ্য করতে না পেরে একটা হিসপ্যানিশ গীটারিস্টের সঙ্গে চলে গিয়েছিল।' ঘড়ি দেখল এড, 'আমাকে উঠতে হবে।'

'তা হলে আজ রাত্রে কোথায় থাকব?'

'কোনও হোটেলে ঢুকে পড়।'

'অসম্ভব। এক সময় আমি এখানে—, সেই সময়কার কথা ভাবো? এই আমি যদি গিয়ে কোনও হোটেলে রুম চাই, তা হলে আমার কোনও দর থাকবে? তা ছাড়া আমার কাছে বেশি ডলার নেই।'

'স্যাম, তুমি কতক্ষণ এখানে আছ?' এড জিজ্ঞাসা করে।

'এই উঠবো। আবার স্লট মেশিনে গিয়ে বসব।'

'কতক্ষণ?'

'ভোর পর্যন্ত।'

'তা হলে তুমি আমার শেষ ডিভোর্সি স্ত্রীকে একটু উপকার কর। তুমি যখন তোমার ঘর আজ রাত্রে ব্যবহার করছ না, তখন ওকে ওখানে একটু ঘুমোতে দাও। আমি কাজ শেষ করে ওকে তুলে নিয়ে আসব। বাই।' এড আমার উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করল না।

তার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে ব্রিজিত বলল, 'লোকটা একই রকম রয়ে গেল। যাক গে, আমি একটা হুইস্কি খাব।'

জিম হুইস্কি দিয়ে বলল, 'তুমি চাইলে আমার ঘরে থাকতে পার। আর আধঘণ্টার মধ্যে আমার ডিউটি শেষ হয়ে যাবে।'

ব্রিজিত কোনও জবাব না দিয়ে এক চুমুকে হুইস্কি শেষ করে বলল, 'এড। কোথায়?'

'বারে। এড যে বলে গেল!'

প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়লাম। ঘর খালি থাকবে ঠিকই কিন্তু ওই ঘরে আমার সুটকেসের ভিতর যাবতীয় সম্পত্তি আছে। সম্পূর্ণ অচেনা ব্রিজিত যদি সেগুলো হাতিয়ে চলে যায়? তা ছাড়া হোটেল কর্তৃপক্ষ তো আপত্তি করতে পারে!

বিল মিটিয়ে রাস্তায় নামতেই ব্রিজিত আমার কনুই ধরল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার জিনিসপত্র?'

'গ্রে হাউন্ড বাস-স্টেশনের লকারে।'

মন্দ লাগছিল না। মধ্যরাতের লস ভেগাসের ফুটপাত তখন আনন্দিত মানুষের ভিড়ে ছটফট করছে। আমি একজন মধ্যবিত্ত বঙ্গসন্তান হাঁটছি জলপাইরঙা সুন্দরীর শরীর ছুঁয়ে। বেশ মিষ্টি গন্ধ বের হচ্ছে ওর পোশাক থেকে।

হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্রিজিত, তুমি কবার বিয়ে করেছ?'

'তিনবার। তুমি?'

'একবার।'

'আমার ঠাকুরমার একবার বিয়ে হয়েছিল। পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে ছিল ওরা, আসলে এখনকার পুরুষরা আগের মত নয়। ঠাকুরদা যেমন ঠাকুরমাকে ভালবাসতেন, তেমনই শাসনও করতেন।'

হেসে বললাম, 'তোমাকে কেউ যদি শাসন করে তুমি মেনে নেবে?'

'যদি বুঝতে পারি সে খুব ভালবাসে আমাকে, তা হলে নিশ্চয়ই মানব।'

ক্যাসিনোতে ঢুকে হোটেলের রিসেপশনে গিয়ে জানতে চাইলাম এই ভদ্রমহিলাকে কি আজ রাত্রে আমার ঘর ব্যবহার করতে দিতে পারি? এখন রিসেপশনে পুরুষ এসেছেন। তিনি বললেন, 'আপনি ঘরে কাকে নিয়ে যাচ্ছেন, তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। তবে ঘর থেকে কোনও জিনিস চুরি হলে আপনাকে দায়ী করা হবে।'

ব্রিজিত শুনছিল। বলল, 'তুমি আমাকে সন্দেহ করছ?'

বললাম, 'না। আমি আইনটা জানতে চাইছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' বলেই সে হাঁটতে লাগল দরজার দিকে। একবারও পিছনে তাকাল না।

রিসেপশনিস্ট বললেন, 'যেতে দিন', আপনি নিশ্চিন্তে ক্যাসিনো উপভোগ করতে পারবেন এখন। তাই না?'

লস ভেগাস থেকে গ্রে হাউন্ডে চেপে আমেরিকার ভিতরে ঢুকছি। লক্ষ করলাম বাসটিতে বেশি মানুষ নেই। দুধারে বাতি চিরে বাসটি ছুটছে তো ছুটছে।

সেই কৈশোর থেকে ইংরাজি টেক্সাস ছবি দেখার একটা ঝোঁক আমার আছে। পাথুরে পাহাড়, বালি, পাহাড়ের ফাঁক গলে ঘোড়ায় চেপে ছুটে যাচ্ছে নায়ক নায়িকাকে নিয়ে, পিছনে ধাওয়া করে আসছে এক ডজন অশ্বারোহী। পরে শুনেছি

হলিউডের ওই সব ছবির শুটিং হয় গ্র্যান্ড ক্যানিউনে। আমার পরবর্তী গন্তব্য সেখানে।

সেই উনিশশো তিন সালে আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গ্র্যান্ড ক্যানিউন ঘুরে দেখার পর লিখেছিলেন, 'এর সৌন্দর্যের কোনও তুলনা নেই। একে ঠিক এই রকম আপনাদের ছেলেমেয়ের জন্য রেখে দিন, তাদের ছেলেমেয়েরাও যেন এইরকম দেখতে পায়, আগামী কালের সব মানুষের জন্য, যেন সবাই একে এই অবস্থায় দেখতে পায়।'

বলা হয়, পৃথিবীর কোথাও গ্র্যান্ড ক্যানিউনের মত নৈশব্দ নেই। সময় যেন স্থির হয়ে থাকে সেখানে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় খুব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাওয়া গেলেও ওখানে গেলে মনে হবে মৃত্যুর পরে অথবা অন্য কোনও নক্ষত্রেই সম্ভবত এ রকম পৃথিবী দেখা যেতে পারে।

ফ্লাগস্টাফে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাস-স্টেশনে নেমেই বুঝলাম ঠান্ডা ভালই। এই বাস চলে যাবে আলবারকুরকের দিকে। আলবারকুরকে শহরের কথা মনে আসতেই ব্রিজিতের কথা মনে পড়ল। এতদিন ওই শহরে মেয়েটা কি করছিল?

গ্র্যান্ড ক্যানিউনের দক্ষিণ দিকের অন্যতম শহর ফ্ল্যাগস্টাফ। খুব বড়সড় নয়, এই সন্ধ্যের ঠান্ডাতেই কুঁকড়ে আছে। মোটেলগুলি সাধারণত বাস-স্টেশনের কাছাকাছি হয়। স্যুটকেশ নিয়ে রাস্তায় পা দিলাম। একেবারে মানুষশূন্য রাস্তা। দুধারে দোতলা বাড়ির দরজা বন্ধ। কনকন হাওয়া বইছে। কয়েক ঘণ্টার তফাতে কি বিপরীত আবহাওয়া!

মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই মোটেলের নিওন সাইন চোখে পড়ল, একটার নিচে লেখা, টোয়েন্টি ফাইভ ডলারস এ ডে, পাশেরটার থার্টি ডলার্স এ ডে। একটু হকচকিয়ে গেলাম। প্রায় কাছাকাছি দুটো মোটেল দুরকম অফার করছে কেন? লোকে তো সস্তার মোটেলেই যাবে। প্রবাদবাক্য মনে এল, সস্তার দুরবস্থা।

ত্রিশ ডলারেই ঢুকে গেলাম। জানলাম ঘর আছে। একদিনের অগ্রিম দিতে হবে। খাতায় সই করে সেই ঘরে গেলাম। একতলার শেষপ্রান্তের ঘরটি বেশ সুন্দর। টিভি, রুম হিটার ইত্যাদি আছে। টয়লেট থেকে বেরিয়ে বিছানায় শুয়ে টিভির রিমোট টিপলাম। একটার পর একটা চ্যানেলে খবর হচ্ছে। কোথাও সোপ অপেরা, কোথাও কোনও ছবি নেই, লেখা ফুটছে, এই চ্যানেলে ছবি দেখতে হলে ডলার দিতে হবে। তার পরেই ছবির নাম দেখতে পেলাম। ছয়টা

ছবি। কোনওটার তিন ডলার, সবচেয়ে মূল্যবানটির আট ডলার। এক্স, ডাবল এক্স, থ্রি এক্স ইত্যাদি।

দরজায় শব্দ হল। দরজা খুলতেই একটি বিপুল মোটা সাদা লোক বলল, 'স্যার, রাত্রে যদি কেউ নক করে তা হলে দয়া করে দরজা খুলবেন না। টেলিফোনে জিরো টিপে ফ্রন্ট ডেস্ককে চাইবেন। ওরা বলে দেবে দরজা খুলবেন কি না।'

'কেন?'

'কদিন হল একটা উৎপাত শুরু হয়েছে হোটেলগুলিতে। তিনটে মেয়ে দল বেঁধে হানা দিচ্ছে সিঙ্গল ট্যুরিস্টদের ঘরে। ভাব জমিয়ে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে জিনিসপত্র নিয়ে হাওয়া হচ্ছে।'

'পুলিশ?'

'পুলিশ চেষ্টা করছে। ধরা পড়ে যাবে যে কোনও দিন। সম্ভবত দিনের বেলায় ওরা একসঙ্গে থাকে না। শুনেছি ওরা খুব সেক্সি। কিন্তু সাবধানে থাকবেন।'

লোকটা চলে গেলে মনে হল এর চেয়ে রোমান্টিক অভিজ্ঞতা আর হবে না। স্যুটকেস থেকে ডলার, ট্রাভেলার্স চেকের ব্যাগটা বের করে বিছানার নিচে গদির তলায় ঢুকিয়ে দিলাম। সদ্য-আসা ট্যুরিস্ট ওখানে টাকা লুকোবে ও কথা নিশ্চয়ই ওরা ভাববে না।

টিভি দেখতে ভাল লাগছিল না। আপাদমস্তক পোশাকে মুড়ে, দরজায় কার্ড ঢুকিয়ে বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম হোটেল থেকে। এখনই যদি এই অবস্থা, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে এখানে কি ঠান্ডা পড়বে কে জানে! শুনশান রাস্তা। ডাইনির চোখের মত আলোগুলো জ্বলছে। হাঁটতে হাঁটতে বারের নিওন সাইন দেখতে পেয়ে সেদিকে পা বাড়ালাম। দরজা ঠেলতেই তামাকের গন্ধ ভক করে নাকে এল। সেই সঙ্গে উত্তাপ—বার ভর্তি। সমবেত জনতা মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখলেন। আমি ধীর পায়ে বারকাউন্টারের সামনে পৌঁছে টুল টেনে বসলাম।

বারম্যান হাসিমুখে ঝুঁকে দাঁড়ালেন, 'ইয়েস জেন্টলম্যান! আই অ্যাম হ্যারি।'

বিদেশে একা বেড়াবার সময় পান করার সময় আমি বিয়ার পছন্দ করি। যদিও জানি ওই বস্তুটি আমার ওজন বাড়াবে কিন্তু কড়া পানীয় খাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া খুবই বোকামি হয়ে দাঁড়ায়। বললাম, 'লোক্যাল বিয়ার।'

'লোক্যাল? ওঃ, সিওর।' একটা মাঝারি সাইজের গোল বোতল সামনে

রাখলেন প্রৌঢ়, 'মনে হচ্ছে তুমি ট্যুরিস্ট?'

'হ্যাঁ। গ্র্যান্ড ক্যানিউন দেখতে এসেছি।'

'গুড। বেশির ভাগ মানুষ এখানে আসে সকালে। ফ্রেড হার্ভে ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানির বাসে চেপে সাউথ ওয়েস্ট ক্যানিউনের খানিকটা দেখে আর বিকেলে বেরিয়ে যায়। তোমার মনে হচ্ছে একটু বেশি দেখার ইচ্ছে আছে?' বারম্যান কথা বলে যাচ্ছিল অন্যদের চাহিদা মেটাতে মেটাতে।

'আমি কোনও খবর না নিয়ে এসেছি। ওরা কোথায় নিয়ে যায়?'

'দাঁড়াও। হাই জিনা, তুমি একটু এখানে আসবে?'

দেখলাম একজন প্রৌঢ়া দূরের টেবিলে আড্ডা মারছিলেন। হাত নেড়ে হাসি মুখে উঠে এসে বললেন, 'মনে হচ্ছে তুমি আমাকে একটা ফ্রি ড্রিঙ্ক দেবে!'

'না। এই ভদ্রলোক ট্যুরিস্ট। আজ এখানে এসেছেন। তোমাদের কোম্পানি সম্পর্কে জানতে চান। আই মিন, ট্যুরগুলো সম্পর্কে। ওঁকে জানাবে?'

জিনা তাঁর মোটাসোটা শরীর ঘুরিয়ে আমাকে দেখলেন, 'যদিও আমি এখন ডিউটিতে নেই তবু হ্যারির কথা শুনতে হচ্ছে। তুমি কোন দেশের লোক?'

'ইন্ডিয়া।'

'দেশটা কোথায়?'

'এশিয়ায়।'

'আমি কখনও নাম শুনিনি।'

হেসে বললাম, 'আমি ইন্ডিয়ান।'

'ওঃ নো। ডোন্ট সে দ্যাট। তুমি কি করে ইন্ডিয়ান হবে। ইন্ডিয়ানরা থাকে এই এ্যারিজোনাতে।'

'ওদের তোমরা এক সময় রেড ইন্ডিয়ান বলতে।' পাসপোর্ট বের করে জিনাকে দেখালাম, ন্যাশনালিস্ট ইন্ডিয়ান। ভদ্রমহিলা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আরও কয়েকজনকে আমার পাশপোর্ট দেখিয়ে এলেন। পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই ইন্ডিয়া দেশটা কোথায়?'

'তুমি আফগানিস্তানের নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'চিন?'

'হ্যাঁ।'

'এই দুটো দেশের মাঝখানে ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান।'

'পাকিস্তান?'

'ইন্ডিয়ার পাশেই।'

'এই নামটা আমি শুনেছি। একজন—। নাঃ, মনে পড়ছে না। যাক গে, তুমি কোথায় উঠেছ?'

মোটেলের নাম বললাম।

মাথা নেড়ে জিনা বলল, 'এখানে এসে তুমি ভাল করেছ। ক্যানিউনের কি দেখতে চাও তা আগে তোমাকে ঠিক করে নিতে হবে। ফ্রেড হার্ভে কোম্পানি রোজ সাত রকমের ট্যুর অপারেট করে। সবগুলি নিলে তোমাকে কয়েকটা দিন থাকতে হবে। প্রথম ট্যুরটার নাম দি হারমিট রোড ট্যুর, রোজ সকাল সাড়ে নটা আর আড়াইটের সময় বাস ছাড়ে। ট্যুরটা দু ঘণ্টার। ওল্ড ওয়াগন রোড ধরে আট মাইল গিয়ে গ্র্যান্ড ক্যানিউনের ভিতরে পৌঁছে যায়। ব্রাইট এঞ্জেলস হাইকিং, মিডল ট্রেইল, কোলোরাডো নদী দেখিয়ে হারমিটস রেস্টে গিয়ে থামে। ওই হারমিটস রেস্ট বাড়িটি উনিশশো চৌদ্দ সালে মেরি জেন কোল্টার তৈরি করেছিলেন।' হাসলেন জিনা, 'ইউনিক বিল্ডিং অফ নেটিভ স্টোন।'

'দ্বিতীয় ট্যুরটির নাম ডি ডেজার্ট ভিউ ট্যুর। সাড়ে তিনঘণ্টা ধরে বাহান্ন মাইলব্যাপী যা কিছু সব ট্যুরিস্টদের দেখানো হয়। এই ট্যুরে মরুভূমির অপূর্ব দৃশ্য যা গ্র্যান্ড ক্যানিউন গ্রাম থেকে পঁচিশ মাইল দূরে দেখানো হয়।'

এছাড়া আছে কম্বিনেশন ট্যুর, সানসেট ট্যুর, মনুমেন্ট ভ্যালি এক্সপেডিশন, দি স্মুথ ওয়াটার রিভার র‍্যাফ্‌ট এক্সারসন, দি এনসিয়েন্ট ওয়ানস।

শুনতে শুনতে সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল। বললাম, 'আমি যদি এই সব ট্যুর যা নিজে একা একা ঘুরে দেখতে চাই?'

'রেন্ট এ কার' থেকে গাড়ি ভাড়া করে চলে যাও।'

'কিন্তু আমার তো এ দেশে গাড়ি চালাবার লাইসেন্স নেই?'

আমার কথা শুনে জিনা একটু ভাবলেন, 'দেখি কি করতে পারি।'

এবার আমি ওঁকে বিয়ার অফার করলাম।

জিনা হাসলেন, 'তা হলে তুমি আমাদের টেবিলে আসতে পার।'

তিনজন বসেছিল টেবিলের তিন পাশে। একজন বৃদ্ধ। আর একজন বৃদ্ধা। তৃতীয় জনকে যুবক বলা যেতে পারে। চল্লিশের কাছে হলেও শরীর বেশ পেটা। জিনা তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ওঁর বাবা-মা আর স্বামী। চমকে উঠলাম। জিনার মোটাসোটা প্রৌঢ়ত্ব বলছে তাঁর বয়স পঞ্চাশের ওপারে। কিন্তু

কৌতূহলী হওয়া যে মুর্খামি হবে তা জানা থাকায় চুপ করে হাত মেলালাম।

পাঁচটা বিয়ার এসে গেল। ওঁরা নিজেদের গ্লাস ওপরে তুলে আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকার প্রার্থনা করলেন।

জিনা বললেন, 'বাবা, ক্যানিউনকে খুব ভালভাবে চেনেন।'

বৃদ্ধ হাত নাড়লেন, 'অসম্ভব'। ক্যানিউনকে চেনা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই পাহাড়ের ক্রিফগুলো, বালির ঝড়, ভয়ংকর নদী ক্রমাগত চরিত্র বদলায়। তা ছাড়া যারা ক্যানিউনকে ওপর ওপর দেখে আসে অর্ধেকটা দ্যাখে। ওর ভিতরের চরিত্রটা অনেক বেশি রহস্যময়।'

একটানা কথাগুলি বলেই বৃদ্ধ চুপ করে গেলেন।

জিনা বললেন, 'কাল সকালে আমাদের স্টেশনে চলে এসো। যে কোনও লোক হদিশ বলে দেবে।'

রাত হচ্ছিল, উঠব উঠব করছিলাম, এই সময় বারে ঢুকল যে মেয়েটি, সে অবলীলায় টেক্সাস ছবির নায়িকা হতে পারে, মেয়েটি সোজা চলে এল আমাদের টেবিলে। তারপর চকাস চকাস করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং জিনার গালে চুমু খেল। জিনার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাই!'

স্বামী জবাব দিল, 'হাই।'

'তুই আজ আসচি বলে তো ফোন করিসনি?' জিনা বলল।

'হঠাৎই ছুটি পেয়ে এসেছি, বাড়ি বন্ধ বলে স্যুটকেসটা বারান্দার কোণে রেখে এসেছি।' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল মেয়েটি।

জিনা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আমার মেয়ে। উইকেন বার্গে চাকরি করে, তোমার নামটা কি যেন?'

সমরেশ বলতে গিয়ে স্যাম বললাম ওঁর সুবিধের জন্যে।

জিনা মেয়ের দিকে তাকালেন, 'লীন, হি ইজ স্যাম, ট্যুরিস্ট, কামিং ফ্রম ইন্ডিয়া।'

'ইন্ডিয়া।' লীন আমার দিকে তাকাল, 'রাভিসাংকার। দি মিউজিসিয়ান?'

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ। তার পর উঠে গুডনাইট বলে বেরিয়ে এলাম। আমাদের দেশের যে কোনও শিক্ষিত মানুষ পৃথিবীর অনেক কিছু জানেন। মনে হয় এরা নিজেদের বাইরে কোনও কিছুর খবর রাখার প্রয়োজন মনে করে না।

নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। শেষপর্যন্ত মোটেলের নিওন সাইন

চোখে পড়ায় স্বস্তি এল। স্বস্তির সঙ্গে খিদে। মোটেলের একপাশে ফাস্টফুডের দোকান দেখে সেটায় ঢুকলাম। এখন সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু চিকেন স্যান্ডউইচ ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না। তাই কিনে ঘরে ঢুকলাম।

স্যান্ডউইচের সঙ্গে জল নিতে টিভির চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে একটি লোক্যাল চ্যানেলে আটকে গেলাম। গ্র্যান্ড ক্যানিউন কীভাবে তৈরি হয়েছিল তা বর্ণনা করা হচ্ছে। পৃথিবী যখন একটু একটু করে ঠাণ্ডা হল তখন আগ্নেয়গিরির লাভা জমে জমে অদ্ভুত আকৃতি নিয়েছিল এই অঞ্চলে। কোটি বছর লেগে গিয়েছিল তাদের গরমে, কিন্তু এখনকার ক্যানিউন তৈরি হয়েছে ছয় মিলিয়ন বছরে। এখনকার ক্যানিউন তৈরি হয়েছে কোলোরাডো নদী দিয়ে বয়ে আসা লাভার সেডিমেন্ট এবং অন্যান্য পদার্থ থেকে। জল এবং বাতাস তাকে ক্রমশ ভয়ংকর চেহারা দিয়েছিল। এই পাথুরে ভয়ংকর সৌন্দর্য তারই পরিণতি।

পণ্ডিতরা বলেন, এগারো হাজার বছর আগে পালিও ইন্ডিয়ানরা প্রথম এখানে আস্তানা গাড়ে। ওই পালিও সংস্কৃতি থেকেই আরকাইক সংস্কৃতির জন্ম। ক্যানিউনের হৃদপিণ্ড হল কোলোরাডো নদী, এর দৈর্ঘ্য আঠারোশো মাইল। নদীটি নাব্য নয়। মাঝে-মাঝেই বিশাল পাথর নদীর স্রোতকে পঁচিশ মাইল গতি দিয়েছে। ঝড় উঠলে পাথুরে পাহাড়ে ধাক্কা লাগা হাওয়ার শব্দে উত্তাল হয়ে ওঠে নদী, ভয়ংকর দেখায় তখন।

কি কি দেখার আছে ক্যানিউনে? মার্বেল জর্জ, ট্রাভস্টাইন ফল্‌স, ফ্যান্টম র‍্যাঞ্চ, টিউসেয়ান বুইন, ব্রাইট অ্যাঞ্জেল ট্রেইল, সাউথ কাইবার ট্রেইল, হারমিট ট্রেইল—আর মনে রাখতে পারিনি।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তৈরি হতে আটটা বেজে গেল। মোটেলের বিল চুকিয়ে স্যুটকেসটা ওদের অফিসে রেখে ফ্রেড হার্ভে ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানির হদিস জেনে নিয়ে রাস্তায় পা ফেললাম। একটু শীত শীত ভাব, রোদ ওঠেনি। তবে রাস্তায় এখন বেশ মানুষ দেখতে পাচ্ছি।

ফ্ল্যাগস্টাফে বাস টার্মিনাসের কাছাকাছি যেতেই চোখে পড়ল সাইনবোর্ড, ... হোপি বাস লাইনস, ট্রান্সপোর্টেশন টু গ্র্যান্ড ক্যানিউন ফ্রম ফ্ল্যাগস্টাফ। দাঁড়িয়ে ভাবছি এমন সময়...কানে এল, 'হাই স্যাম!'

মুখ ফিরিয়ে দেখি লীন এগিয়ে আসছে।

'হাই লীন!' হাসলাম।

'ক্যানিউনে যাচ্ছেন?'

'সে রকম ইচ্ছে আছে।'

'গুড। ঘুরে আসুন। আমার অবশ্য হাতে কোনও কাজ নেই। আপনার সঙ্গে গিয়ে সাড়ে দশটার সিনেমাটা দেখতে পারি।' ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা নোয়ালো সে।

'সিনেমা? এর মধ্যে সিনেমা এল কি করে?'

'মাই গড! আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। টিকিট কেটেছেন?'

'না।'

'যান কেটে নিন। আমাকে সবাই চেনে, টিকিট লাগে না আমার।'

টিকিট কেটে বাসে উঠলাম। লীন আমার পাশে বসেছে। ছোট বাস, অল্প সময়েই ভর্তি হয়ে গেল। লীন বলল, 'আপনি গ্র্যান্ড ক্যানিউন আইম্যাক্সের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন? শোনেননি? ওখানে ওয়ার্কড সার্জেন্ট মোশন পিকচার সিস্টেম আছে। এখন যে ছবিটা দেখানো হচ্ছে, তার নাম, গ্র্যান্ড ক্যানিউন—দি হিডেন সিক্রেটস। শুনেছি দারুণ ছবি হয়েছে।'

ওঁরা বলেন আইম্যাক্স হল এক নম্বর আকর্ষণ। একেবারে নির্জন জায়গায় বিশাল জায়গা নিয়ে তৈরি আইম্যাক্স প্রেক্ষাগৃহে শুধু সিনেমা নয়, রেস্টুরেন্ট থেকে যাবতীয় প্রমোদের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্র্যান্ড ক্যানিউন আইম্যাক্স থিটেয়ারের ফিল্ম প্রোডাকশনের দায়িত্বে ছিলেন আকাদেমি পুরস্কার-প্রাপ্ত কিথ মেরিল, সংগীতে বিল কস্টি। সত্তর ফুটের পর্দা, ছয় ট্রাকের ডলবি সাউন্ড সিস্টেমে ছবি দেখানো হয়। মাত্র চৌত্রিশ মিনিটে গ্র্যান্ড ক্যানিউনকে আবিষ্কার করার যে আনন্দ তার কোনও তুলনা নেই।

এতবড় পর্দায় যখন কলোরাডো নদী ঝাঁপিয়ে পড়ছে তখন মনে হচ্ছিল যে, আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ক্যানিউনের পাহাড়ি খাদ, তার ক্লিফ, ভয়ংকর বাতাস, ধুলোর ঝড়, সাহসী অভিযাত্রীদের নৌকো-পাগলামি, কি নেই ছবিটায়।

বাইরে বেরিয়ে এসে লীনকে ধন্যবাদ জানালাম। সে না বললে হয়ত এই অভিজ্ঞতা আমার হত না।

লীন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোন ট্যুরটা নেবেন?'

ফাঁপরে পড়লাম। এটা দেখি না ওটা দেখি? শেষ পর্যন্ত ওকেই জিজ্ঞাসা করলাম। লীন বলল, 'আপনি যদি আর পাঁচটা ট্যুরিস্টের মত সব কিছুর উপর চোখ বুলিয়ে আসতে চান তা হলে এক ধরনের ব্যাপার হবে, আর যদি শুধু একটি জায়গায় দিনটা কাটাতে চান তা হলে—।'

'একটি জায়গায় দিনটা কাটাতে চাই।' ওকে থামিয়ে দিলাম, 'একটু আগে ছবিতে যা দেখলাম এত কাছে গিয়ে নিশ্চয়ই দেখতে পাব না? তাই কার্তিক না হয়ে গণেশ হওয়াই ভাল।'

'মানে?' অবাক হয়ে তাকাল লীন।

হেসে বললাম, 'কিছু না। তাহলে—!'

'ছবিটা দেখার পর নেশা চেপেছে। চলুন আপনার সঙ্গে দিনটা কাটাই।'

'আমার সঙ্গে? আমি আনন্দিত হলাম।'

'আপত্তি আছে?'

'আমি হাত ধুয়ে বসে আছি আর তুমি জিজ্ঞাসা করছ খাব কি না?'

কথাটার মানে বুঝতে পেরে হো হো করে হাসল লীন। হাসি থামলে গম্ভীর মুখে বললাম, 'তবে ওই একটা দিন, তার বেশি কাটাতে চেও না।'

ও হকচকিয়ে গেল, 'কেন?'

'তার বেশি আমার সহ্য হবে না।'

'মাই গড! তুমি কি জানো আমি একটু কৃপা করব এই আশায় কত ছেলে বসে আছে। ওরা তোমার কথা শুনলে পাগল ভাববে।'

'ভাবুক। কিন্তু আমি সত্যিকারের পাগল হতে চাই না।'

'ওকে! লেটস গো টু দ্য গ্র্যান্ড ক্যানিউন ভিলেজ।'

হঠাৎ মনে হল ভিলেজে গেলে মানুষ দেখা যাবে। এখানকার মানুষ। যাদের ব্রিটিশরা বলত রেড ইন্ডিয়ান। এখন বলা হয় আমেরিকান নেটিভ।

পাথুরে পাহাড়ি পথ, ধুলো উড়ছে মাঝে মাঝে। চারপাশের প্রকৃতি বড় রুক্ষ। আমার পাশে দীর্ঘসঙ্গিনী সুন্দরী বসে চিউংগাম চিবিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি রোজ স্নান করো?'

'শুতে যাওয়ার আগে স্নান না করলে আমার ঘুম আসে না। তবে আমি দুবার আন্ডার গার্মেন্টস চেঞ্জ করি। কেন?'

'এস্কিমো মেয়েরা কখনওই স্নান করে না।' বললাম।

'ইন্ডিয়ান মেয়েরা? আই মিন তোমার দেশের মেয়েরা?'

'ওরা তো স্নানের ওপরেই আছে।'

'সে কি?'

'আমার দেশের মেয়েদের শরীর খুব পবিত্র, কারণ তারা নোংরা জমতে দেয় না। জলের তো অভাব নেই।'

'তাই বলো।' সে আবার চোখ বন্ধ করল, চোয়াল নাড়তে লাগল।

গ্র্যান্ড ক্যানিউন ভিলেজ সম্পর্কে বলা হয় জায়গাটা শুধু ট্যুরিজমের কেন্দ্রবিন্দু নয়, ইতিহাসের স্মৃতি চারপাশে ছড়ানো। আমরা যেখানে নামলাম সেখানে যেন ইতিহাস শতাব্দীর আগে এসে থেমে গিয়েছে।

লীন দেখাল, 'ওইটি হল গোপি হাউস, ওপাশে এল টোভার হোটেল। দোকানগুলি দেখলাম। আমেরিকার আদিবাসীদের হাতের কাজ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই আদিবাসীদের ইন্ডিয়ান পরিচিতি কি করে হল তার সদুত্তর পাওয়া গেল না। পিক ভিউতে পৌঁছে আর একটা ধাক্কা খেলাম। সিমেন্টের দেওয়ালে সামনের পাহাড়ের মানচিত্র আঁকা রয়েছে। কোন চূড়ার কি নাম, কত উচ্চতা। অবাক হয়ে দেখলাম, পাশাপাশি তিনটি চূড়ার শিবা, রামা, কৃষ্ণা। অবশ্যই এই নামকরণের সঙ্গে আমেরিকার আদিবাসীদের কোনও সংযোগ নেই। হয়তো ভারতপ্রেমিক কোনও আমেরিকান নামকরণ করেছেন।

লীন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার খিদে পায়নি?'

বললাম, 'পেয়েছে। কিন্তু আমেরিকান নেটিভদের খাবার খাব।'

ও খুব মজা পেল। তার পর খুঁজে বের করা হল একটা রেস্টুরেন্ট।

এখন ওরা মাথায় পালকের মুকুট পরে না, অন্তত ওখানে তো নেই। কিন্তু মুখের ফোলা ফোলা ভাব, কিছুটা মঙ্গোলিয়ান ধাঁচ...নিজস্বতা দিয়েছে। রেস্টুরেন্টের চেহারা সেই টেক্সাস ছবির মত, যেখানে যে কোনও মুহূর্তে গুলি চলতে পারে।

কোমরে অ্যাপ্রন বাঁধা একজন বয়স্কা মহিলা এগিয়ে আসতেই বললাম, 'বিয়ার।'

'টিনের বিয়ার না লোক্যাল বিয়ার?'

প্রশ্ন শুনে লীনের দিকে তাকালাম। সে চোখ মারল, 'লোক্যাল।'

মহিলা চলে গেলে লীন বলল, 'খেয়ে দ্যাখো, মজা পাবে।'

বাংলাদেশের বন্ধুরা সুস্বাদু খাবার খেয়ে বলে, খুব মজা পাইলাম। এই মেয়েটি ফান শব্দটি ব্যবহার করল। আমরা মজা পাই না, ভাল লাগে।

কালচে রঙা খাটো বোতলে বিয়ার এল, কোনও গ্লাস সঙ্গে আনেননি মহিলা।

লীন বোতল থেকে সরাসরি গলায় ঢেলে মুখ বিকৃত করল। তারপর বলল, 'আঃ। দারুণ।'

অল্প মুখে নিলাম। বদখত গন্ধ। গিলতে গিয়ে বুঝলাম কেন লীন মুখ বিকৃত

করেছিল। কিন্তু তারপরেই শরীরে বেশ আরাম ছড়িয়ে পড়ল। তৃতীয় বারের চুমুকে জ্বলুনি নেই ততক্ষণে অর্ডার দিয়ে দিয়েছে লীন, মিক্সড ভেজিটেবল, ভেড়ার মাংসের রোস্ট আর রুটি।

বললাম, 'ওদের ফুডহ্যাবিট তা হলে আলাদা নয়।'

'শুনেছি আগে এখানে খরগোশ বা হরিণের মাংস পাওয়া যেত। এখন সরকার সেগুলি বিক্রি করতে নিষেধ করায় আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।'

বোতল শেষ হয়ে যেতে আমি আবার আনতে বললাম।

খাবার আসার আগেই বিয়ার এসে গেল। দ্বিতীয় বোতল শেষ হতে বুঝলাম শরীর আলগা হয়েছে। খাবার এল। এক প্লেট ভাত, অনেকটা মাংস, পোড়া পোড়া, এক বাটি সবজি, শুধুই সেদ্ধ করে নুন ছড়ানো। দেখলাম, অনেকটা মাংস চিবিয়ে লীন এক চামচ ভাত মুখে দিচ্ছে। পোড়া পোড়া চেহারা হলেও মাংস তুলতুলে নরম। সবজি খেতে পারলাম না। চব্বিশ ডলার দক্ষিণা দিয়ে রাস্তায় বের হতেই লীন বলল, 'আমার শরীরটা কী রকম লাগছে। গা গুলোচ্ছে। আই নিড রেস্ট।'

কি করি। দেখলাম ওর দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। টলছে।

সামনেই একটা হোটেল দেখে ওকে নিয়ে গেলাম। ঘর পাওয়া গেল। দরজা খুলতেই দৌড়ে গেল লীন, বেসিনে ঢেলে দিল পেটে যা ছিল। তার পর মুখে জল দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর ইউ ওকে?' চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল সে, সাড়া দিল না।

'ডাক্তার ডেকে আনব?'

মাথা নাড়ল, না।

ওকে ঘুমোতে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে বাইরে এলাম। হঠাৎ মনে হল ওই ব্যাপারটা আমার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। বিয়ার এত কড়া যে শরীরে প্রতিক্রিয়া তৈরি করেই চলেছে। তবু খানিকটা হাঁটাহাঁটি করলাম। একটা মিউজিয়মে ঢুকে আমেরিকান নেটিভদের ব্যবহৃত সেকালের অস্ত্র, তাদের হাতের কাজ ইত্যাদি দেখলাম।

গ্র্যান্ড ক্যানিউন আবিষ্কৃত হয়েছে পনেরশো চল্লিশ সালে। স্প্যানিশ অভিযাত্রী গার্সিয়া লোপেজ ডি কার্ডিনাস সেই আবিষ্কারক। অর্থাৎ পাঁচশো বছরও হয়নি। তার অনেক অনেক পরে আমেরিকার জন্ম। এল-ডোরাডোর কথা মনে এল।

সোনার সন্ধানে ছুটে এসেছিল ইউরোপীয় লোভী মানুষেরা। টেক্সাস থেকে এ্যারিজোনা, আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে মাটির তলায় সোনা রয়েছে, যাও, তুলে নিয়ে বড়লোক হয়ে যাও। সেই সোনার খোঁজে এসে কত মানুষ মরে গিয়েছে এখানে। আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের লড়াই হয়েছে।

মোটেলে ফিরে এলাম। ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম সেটা এখনও বন্ধ। চাপ দিতে খুলে গেল। বিছানায় লীন নেই। ঘরেও না। সর্বনাশ, মেয়েটা গেল কোথায়? আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল নাকি? ভাবলাম ফ্রন্ট ডেস্কে গিয়ে খোঁজ নিই। তখনই চোখে পড়ল ওর জিনস, জুতো, জামা টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত। টয়লেটের দিকে তাকালাম। দরজা বন্ধ, জলের শব্দ হচ্ছিল, সেটা বন্ধ হল। তার মানে ও স্নান করছে এবং অসুস্থ নয়। কিন্তু জামা-প্যান্ট ভিতরে নিয়ে যায়নি কেন? আমার এখানে থাকা শোভন নয় মনে করে পা বাড়াতে যেতেই দরজা খুলে গেল, 'হাই।'

দেখলাম লীন তোয়ালে দিয়ে চুল মুছছে। এবং কি দেখলাম! কোনারকের সেই সুন্দরী পাথুরে নায়িকাও এর পাশে কিছু না। কোমরে এবং উর্ধাঙ্গে দুই চিলতে অন্তর্বাসের আড়াল ছাড়া ওর দীর্ঘ শরীরের গঠন দেখলে কুম্ভকর্ণ এক মিনিটও ঘুমোতে পারত না।

'এখন অনেক ফ্রেশ লাগছে। হঠাৎ যে কি হয়ে গেল, তোমাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছিলাম, না?' মাথায় তোয়ালে ঘষতে ঘষতে লীন আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমার শ্বাস কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে? শরীরের সব রক্ত যেন শিরা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ও কি ভাবছে আমাকে? আমি কি পুরুষ নই? এই খাট, টেবিল-চেয়ারের মত প্রাণহীন আসবাব? এই বেশে আমার সামনে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে ওর বিন্দুমাত্র সংকোচ হচ্ছে না। কারণ বোধ হয় আমাকে মানুষ হিসাবে পাত্তাই দিচ্ছে না।

'স্যাম, তোমাদের দেশের মেয়েরা কি আমার থেকেও সুন্দরী?'

হাসতে চেষ্টা করলাম, 'বোধ হয়।'

'বোধহয় কেন?'

'আমি তাদের কাউকে এই পোশাকে দেখিনি।'

'আমাকে দেখে কেমন লাগছে তোমার?' সে আয়নায় আমাকে দেখল।

'খুব ভাল।'

'আমি আজ অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছি।'

'গুড।'

তোয়ালেটা রেখে দিয়ে লীন জিজ্ঞাসা করল, 'তা হলে আমি প্যান্ট পরে নিতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

সে পোশাক পরল। পরতে পরতে বলল, 'ওই সেকেন্ড বিয়ারটা খেয়েই বিপদে পড়লাম। তুমি দেখছি ঠিকই আছ। আসলে আমি অকেশনালি মদ খাই। আর আমাদের বিয়ারে অ্যালকোহলের পরিমাণ এত কম থাকে যে, ওকে মদ বলাই উচিত নয়। কটা বাজে?' জুতোয় পা গলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল লীন।

বললাম। 'চল, এবার আমরা কড়া কফি খাব।'

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। হোটেলের ভিতরেই কফি কর্ণার আছে। দুটো কফি নিয়ে মুখোমুখি বসলাম। লীন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার তো ওই ভিলেজটাও ভাল করে দেখা হল না। কদিন আছো?'

'কালই চলে যাব।'

'সেকি? ক্যানিউন দেখবে না?'

'যতটুকু দেখেছি তাই যথেষ্ট।'

'আমার জন্যে তোমার দিনটা নষ্ট হল!'

'না। তোমার বদলে আমার শরীরও অসুস্থ হতে পারত।'

হঠাৎ লীন বলল, 'তোমার মত লোকের সঙ্গে আমার আগে কখনও আলাপ হয়নি।'

'কি রকম?'

'আমার পরিচিত যে কোনও ছেলে আজ আমাকে রেপ করত, না করলে আমি তাকে করতাম। কিন্তু তোমার বেলায় সেটা হল না। ওই পোশাকে আমাকে দেখে কোনও ছেলে ছেড়ে দেবে এ আমি ভাবতেই পারছি না। তুমি আমাকে ছুঁয়েও দেখলে না। আমার কোন চাহিদাই তোমার কাছে ওই মুহূর্তে ছিল না। আমি এতই মূল্যহীন!'

'দ্যাখো, তোমাকে আমি ভাল করে চিনি না। আমাদের মধ্যে সেই সম্পর্ক তৈরি হয়নি। আমি এগিয়ে গেলে তুমি ফিরিয়ে দিতে পারতে। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি।'

'করলে, আমি তোমাকে রিফ্যুজ করতাম। তাতে আমার সম্মান বাঁচতো। তুমি মনে করো না আমাকে জড়িয়ে ধরলেই আমি শুতে রাজি হতাম। কিন্তু এতদিন মনে মনে যে গর্ব লালন করেছি, সেটায় চিড় ধরত না। অনেক ধন্যবাদ।'

লীনের কথাগুলি শুনে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম কথাটা।

শুনে সে অবাক হল, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। ওই অবস্থায় তোমাকে দেখলে ঈশ্বরেরও ধ্যান ভেঙে যাবে আমি তো সামান্য একটা মানুষ। আমাদের পৌরাণিক কাহিনিতে আছে সাধু-সন্ন্যাসীদের সামনে এসে স্বর্গের সুন্দরী নর্তকীরা নাচলেই তাঁদের ধ্যান ভেঙে যেত এবং কেউ কেউ বাচ্চার মা হয়ে যেতেন। একজন ভগবান চিনতে না পেরে নিজের মেয়েকে ধর্ষণ করতে ছুটেছিলেন। তিনি তোমাকে দেখলে যে কি করতেন কে জানে!'

'সেই ভগবানের কোনও নাম আছে?'

'হ্যাঁ। শিব যার নামে একটা চূড়ার নামকরণ করা হয়েছে এখানে।'

'আচ্ছা। কিন্তু তোমাদের কজন ভগবান আছেন?'

'অনেক। তবে তাঁরা এই কলিকালে পৃথিবীতে আসেন না।'

'কেন?'

'আমি ঠিক জানি না। হয়তো এলে যদি অসুখে পড়ে যান!'

'অসুখ? তুমি কি এইডসের কথা বলছ? শুনেছি আগের কালে এইডস ছিল না। তা হলে তোমাদের ভগবানও এইডসের ভয় পান?'

'তোমাদের ভগবান পান না?'

'বোধ হয় না। কারণ আমাদের ভগবান যদি কিছু করেন, তা আমাদের চোখের আড়ালে। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি মেয়েদের এড়িয়ে চলেন। তাঁর ছেলে যেশাস, সব কজন সেন্ট পুরুষ। মেয়েদের কোনও জায়গা নেই সেখানে।'

আচমকা মুখ ফেরালো সে, 'স্যাম, তুমিও অসুখের ভয় পাওনি তো?'

'তখন ওসব ভয় ছিল না।'

'ধন্যবাদ। তবে তোমার জেনে রাখা দরকার, আমি অসুখ মুক্ত।'

'আমিও।' ঘড়ি দেখলাম।

'ফিরতে চাও? ওঠা যাক।'

ফ্ল্যাগস্টাফে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাস থেকে নেমে আমি লীনের হাত ধরলাম। 'তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

'কেন?'

'আমার গ্র্যান্ড ক্যানিউনে আসা সার্থক হয়েছে। এই প্রকৃতি তার ভয়ংকর সৌন্দর্য নিয়ে চিরকাল থাকবে। লক্ষ লক্ষ লোক দেখেছে এবং দেখবে। কিন্তু আজ ওখানে গিয়ে আমি যে স্মৃতি সঞ্চয় করলাম তা কেউ পায়নি, পাবে না।'

এই প্রথম লীনের মুখে রক্ত জমতে দেখলাম। ঠোঁটটা কাঁপল। তার পরেই ওর চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল, 'তুমি খুব ভাল। ফ্রেস হয়ে রাত্রে চলে এসো বারে! আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

সেই রাতে গ্রে হাউন্ড বাসের নরম সিটে বসে চলে গিয়েছিলাম ফ্ল্যাগস্টাফ ছেড়ে।

সন্ধ্যের পরে গ্র্যান্ড হোটেলের ফুটপাত দিয়ে হকারদের বাঁচিয়ে হেঁটে আসার সময় প্রায়ই একজনের ওপর নজর চলে যেত, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, বেশ ফর্সা, চোখ মুখ নীরদ মজুমদারের আঁকা সিল্ক বসনা সুন্দরীর মত অবিকল। পোশাকে বেশ আভিজাত্য, যেন কারও আসার কথা অথচ লোকটি আসছে না সময়মতো, মাঝে-মাঝে ঘড়ি দেখছেন, ঈষৎ বিরক্ত।

এই মহিলাকে যখন প্রায়ই দেখতে লাগলাম তখন ভাবতাম উনি কার জন্যে এত ঘন ঘন এখানে এসে অপেক্ষায় থাকেন? সঙ্গে এক সাংবাদিক বন্ধু ছিলেন। তিনি জানতেন, ইনি অবশ্যই একজন কলগার্ল, খদ্দের ধরতে আসেন। তবে হেঁজিপেঁজি খদ্দের হলে চলবে না, গাড়ি থাকা অবশ্যই দরকার। সাংবাদিকরা সোর্স বলতে বাধ্য নন, তাই ওঁর ব্যাপারে বিশদ জানতে পারিনি এবং কিছুদিন পরেই ওঁকে আর দেখতে পেতাম না। সত্যি কথা বলতে কি, ওঁর অভাবে গ্র্যান্ডের ফুটপাতটা একেবারে খাঁ-খাঁ করতে লাগল।

বছর তিনেক বাদে লন্ডনে গিয়ে কয়েকদিন ছিলাম। সন্ধ্যেবেলায় বিবিসি-র

ক্যান্টিনে গেলে দীপঙ্কর, সিরাজুল, মানসীদের সঙ্গে চমৎকার আড্ডা হত। ওঁরা খুব বন্ধুবৎসল বলে পেটপুরে পানাহার হত বিনাপয়সায়। কিন্তু দিনের বেলায় কাজ না থাকলে বিশ্রি বেকার হয়ে যেতাম।

ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে যে রাস্তাটা ওল্ডউইয়ের দিকে গিয়েছে, সেদিকে মিনিট খানেক হাঁটলে ডান হাতে পাঁচতারা হোটেলটাকে রেখে কয়েক পা গেলেই ডানদিকে একটা গলি পাওয়া যাবে। সেই গলি দিয়ে এগোলে একটা তেমাথার মোড়, মোড়ের মাঝখানের বাড়িটা একটা দরজা দিয়ে সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। মাটির তলায় বিশাল হল ঘর। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। লন্ডন এবং তার আশপাশের শহরে যে ঘোড়দৌড় হচ্ছে তা টিভিতে দেখানো হচ্ছে এখানে। সেটা দেখার আগে কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কাটতে হয়। পছন্দের ঘোড়া জিতলে সঙ্গে সঙ্গে পেমেন্ট। একে বলা হয় অফ ট্র্যাক বেটিং সেন্টার। যাঁরা রেসে যেতে পারেন না সময়ের অভাবে তাঁরা এখানে এসে টুক করে রেস খেলে চলে যান।

সময় কাটানোর জন্যে মাঝে-মাঝেই ওখানে যেতাম আমি। খেলি বা দেখি কোনও একটা রেসে একটা ঘোড়াকে পছন্দ করে নিলেই তো হয়। তার পর সেই ঘোড়া যখন দৌড়চ্ছে, তখন তাকে জেতাবার জন্যে যে উত্তেজনা তার মৌতাতে একঘেয়েমি চমৎকার কেটে যায়। পাঁচ-ছটা রেস এক পয়সাও না খেলে ঘোড়া নির্বাচন করে যদি দেখি আমার পছন্দের কোনও ঘোড়াই জেতেনি, তখন খুব আনন্দ হয়। প্রতি রেসে অন্তত এক পাউন্ড করে খেললে পাঁচ-ছয় পাউন্ড নির্ঘাৎ হারতাম। সেটা পকেটে থাকা আর জিতে যাওয়ার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

দিনটা ছিল মেঘের এবং টিপটিপে বৃষ্টির। দুপুরবেলায় হাজির হয়েছিলাম ওই ঘরে। বেশ জমজমাট ভিড়। বুঝলাম লাঞ্চের সুযোগে অফিস থেকে বেরিয়ে সাহেববাবুরা ভাগ্য যাচাই করতে এসেছেন। আধঘণ্টার মধ্যে ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল। নারী-পুরুষ এখানে এসে ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করে না। সবাই মন দিয়ে হিসাব করছে, কোন ঘোড়া জিতবে। ওই মুখগুলো দেখতে আমার বেশ লাগে। সবাই তখন একাগ্রচিত্তে অর্জুনের মত মাছের চোখ দেখতে চাইছে।

অনেকক্ষণ ধরে রেস দেখতে দেখতে ইচ্ছে হল এক পাউন্ড খেলার। পরের রেসের তিন নম্বর ঘোড়া জিতবে ভেবে টিকিট কাউন্টারে যেতে লোকটি আমার মুখের দিকে তাকাল। সাধারণত কাউন্টারে বসা লোকগুলির মুখে নির্লিপ্তি থাকে। কিন্তু এই লোকটি বলল, 'তুমি তো খেলো না, শুধু দ্যাখো। তাই ওয়েলকাম।'

অর্থাৎ তোমার ওই পাউন্ডটির শ্রাদ্ধ হবে এখনই তাই অভিনন্দন। আমি যে খেলি না তাও লোকটা কাউন্টারে বসে লক্ষ্য করেছে। হেরে গেলাম। তৃতীয় হয়ে রেস শেষ করল আমার তিন নম্বর ঘোড়া। বিরক্ত হয়ে উঠি। উঠে এলাম উপরে। এর পরে ওখানে থাকলে লস মেকআপ করার ইচ্ছে হবে। তাতে হার বেড়ে যেতে পারে।

উপরে উঠতেই চমকে গেলাম। আমি কি ঠিক দেখছি? খাটো স্কার্ট, উঁচু হিলের জুতো, জ্যাকেট, কাঁধে সরু স্ট্র্যাপের ব্যাগ, সিল্কি চুল কাঁধের মাঝবরাবর চলার তালে ঢেউ তুলছে। চকিতেই গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা অভিজাত সুন্দরীকে মনে পড়ে গেল। বড় মিল, খুব মিল। যেন যমজ বোন, অথবা কাছাকাছি চেহারার বোন। কিন্তু ইনি যেভাবে শরীরে মোচড় দিয়ে হাঁটছেন চোখে রোদ-চশমার আড়াল, যদিও রোদ নেই, তাতে পার্থক্যটা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইনি ইংরেজ সুন্দরী নন। অবশ্য লন্ডনে এত দেশের মানুষ একত্রিত যে এঁকে বাঙালি ভাবার কোনও কারণ নেই। গায়ের চামড়ার রং দেখে তো নয়ই। মেক্সিকান বা স্প্যানিস মেয়েদের গায়ের চামড়া তো এ রকমই হয়!

সুন্দরী হেঁটে যাচ্ছেন ফুটপাত ধরে, ট্র্যাফালগার স্কোয়ারের দিকে। ওঁর হাঁটার ভঙ্গি চোখের সুখ বাড়ায়। অতএব আমি পিছনে। প্রচুর মানুষ এখন আসা-যাওয়া করছে। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়াল। সুন্দরী চটপট উঠে গেলেন তাতে। ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল। উজবুকের চেহারা কেমন দেখতে তা তখন আমাকে দেখলেই বোঝা যেত।

ওই মহিলাই যে কলকাতায় দেখা মহিলা তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হচ্ছিল না। আমার বাঙালি চেহারা দেখেই উনি ট্যাক্সিতে উঠে এড়িয়ে যেতেন। আবার ওই মহিলা কেন এই পোশাকে লন্ডনের রাস্তায় হেঁটে বেড়াবেন তারও কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু মোদ্দা কথা, ওঁকে আর খুঁজে পাব না, মন-মেজাজ খিঁচড়ে গেল।

বি-বি-সি-র এক বন্ধুকে বললাম ব্যাপারটা। তিনি উড়িয়ে দিলেন। কলকাতার কোনও স্ট্রিট গার্ল লন্ডনে পাত্তাই পাবে না বলে ঘোষণা করলেন।

লন্ডনে কিছুদিন থেকে প্যারিসে গিয়েছিলাম দিন তিনেকের জন্যে। প্রথমবার প্যারিসে যাই সাতাশি সালে। প্যারিসের সোনারপুর অ্যান্টনি নামের একটি ছোট্ট

শহরে অসীম রায়ের বাড়িতে ছিলাম সেবার। খুব ঘুরেছিলাম। ভার্সাইতে গিয়ে শ্রীযুক্তা প্রীতি সান্যালের বাড়িতে দারুণ রান্না খেয়েছি। সে সময় একটা গল্প শুনেছি। প্যারিস থেকে ভার্সাই যাওয়ার পথে একটা জঙ্গুলে এলাকা আছে। সন্ধের পর সেই রাস্তায় গেলে সাদা উটপাখি দেখা যায়। তারা রাস্তার এধার থেকে ওধারে ছুটে যায়। যখন যায় তখন গাড়ির হেডলাইটের আলো তাদের উপরে পড়ে। দূরত্ব রেখেই তারা ছোটে। কোনও মুগ্ধ ড্রাইভার গাড়ি থামালে উটপাখিরা পাশে চলে আসে। দরদস্তুর করার পর ড্রাইভার রাজি হলে একজন গাড়িতে উঠে বসে। উটপাখির সাজ নাকি ড্রাইভারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই। ব্যাপারটা অভিনব লেগেছিল।

এবার উঠেছি একটা কোরিয়ান হোটেলে। এদের হোটেল বেশ সস্তাই। বিকেলের শেষে পিগ্যালে চলে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে। এখানেই বিখ্যাত নাইট ক্লাবগুলি। তাদের আশপাশে সেক্স শপ। ফরাসিরা ইংরেজি বলতে চায় না, না বোঝার ভান করে। কিন্তু নাইট ক্লাব বা সেক্স শপে ইংরেজির ফোয়ারা।

অনেকটা হেঁটে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলাম। পিগ্যাল যৌবনের লীলাভূমি, ঠিক বলতে গেলে অবৈধ যৌবনের নন্দনকানন। রাত নেমেছে। চারপাশে আলোর ঝরনা। নারী-পুরুষ হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে ফুটপাত দিয়ে। এই সময় তাকে দেখতে পেলাম। সাদা স্কার্ট, হাঁটুর অনেক উপরে, সাদা জ্যাকেট, সাদা উঁচু হিলের জুতো, সাদা সরু স্ট্র্যাপের ব্যাগ। কপালে সাদা হেডব্যান্ড, ঘড়ির স্ট্র্যাপের রঙও সাদা। না। একে আমি লন্ডনে দেখেছি।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সুন্দরী বিরক্ত চোখে তাকাল। ইংরেজিতে বললাম, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু একটু কথা বলতে চাই।'

ভাঙা ইংরেজিতে উত্তর এল, 'এটা তো বলার জায়গা না।'

সাহস করে বললাম, 'জানি, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না। আপনার সঙ্গে কলকাতায় আমার আলাপ হয়েছিল। আমি বাঙালি।'

সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকাল সে। তার পর ইংরেজিতেই বলল, 'দয়া করে খানিকটা দূরত্ব রেখে আমায় অনুসরণ করে আসুন।'

যেন কোনও কথাই হয়নি, এমন ভঙ্গিতে সে হাঁটতে লাগল।

ম্যুলাবুজ ছাড়িয়ে কিছুটা যাওয়ার পর ডানদিকের একটা গেট দিয়ে ঢুকে

গেল সে। কাছে গিয়ে দেখলাম, গেটের উপর লেখা নিওনে জ্বলছে এবং নিভছে 'গ্রেট ফান' শব্দ দুটো।

ভিতরে পা বাড়াতেই বিশাল চেহারার এক আফ্রিকান বাধা দিল, 'ইয়া ম্যান, কাউন্টার, দেয়ার—।'

সে যেদিকে দেখাল সেখানে একটি টিকিট কাউন্টার। নগদ একশো ফ্রাঁ দিয়ে টিকিট কেটে ভিতরে পা বাড়ালাম। সেখানেও একজন আফ্রিকান দরজা আগলে দাঁড়িয়ে। টিকিটটি দেখে সে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিল। ছোট্ট হলঘর। কয়েকটা টেবিল। একটা লোক চেয়ারে বসে আছে। তার সামনে একটি মঙ্গোলিয়ান চেহারার মেয়ে নেচে যাচ্ছে। নাচতে নাচতে শরীর দিয়ে লোকটি শরীর স্পর্শ করছে। লোকটি মুগ্ধ হয়ে দেখছে। লক্ষ্য করলাম লোকটার দুটো হাত বাঁধা। অর্থাৎ সে স্পর্শ করতে পারবে না মেয়েটিকে। নাচ শেষ হতেই মেয়েটি হাতের বাঁধন খুলে দিল। লোকটি কিছু বলতেই সে হেসে ভিতরে যাওয়ার ইশারা করল।

ওরা চলে গেলে আমি চেয়ারে বসলাম। একটি রোগা লোক এগিয়ে এল একটা অ্যালবাম নিয়ে। বলল, 'শো আরম্ভ হবে রাত নটার পর। তুমি যদি কারও সঙ্গে সময় কাটাতে চাও তা হলে এই অ্যালবাম থেকে পছন্দ করতে পার।'

'এর জন্য কত দিতে হবে?'

'নাচ দেখতে দুশো ফ্রাঁ, ভিতরে গেলে হাজার।'

অ্যালবাম ওল্টালাম। যার জন্যে এসেছি তার ছবি নেই। আমাকে মাথা নাড়তে দেখে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'পছন্দ হল না?'

'না।'

'একটি নতুন মেয়ে এসেছে। শী ইজ পাকিস্তানি। পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

একটু পরেই সে এল। সামনে বসে বলল, 'আমি নাচতে পারি না। পাঁচ মিনিট সময় পাবেন কথা বলতে। যা বলার বলুন।'

বাংলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বাঙালি?'

'হ্যাঁ। ছিলাম। এখন পাকিস্তানি।'

'কী রকম?'

'গ্র্যান্ড হোটেলে একজন পাকিস্তানি ব্যবসায়ী এসেছিল। তার সঙ্গে কয়েকদিন ছিলাম। তার আমাকে এত ভাল লেগে গেল চোরা পথে পাকিস্তানে নিয়ে গেল। সেখানে পাকিস্তানী পাশপোর্ট বানিয়ে লন্ডনে এনে বিক্রি করে দিল। যে কিনল

সে এক সপ্তাহ লন্ডনে এক সপ্তাহে প্যারিসে কাজ করায়।'

'আপনার কী লাভ?'

'আমাকে থাকা-খাওয়া পোশাক ছাড়া ছয়শো পাউন্ড মাসে দেয়। তার তিনশো পাউন্ড দেশে পাঠাই। প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা।'

'কোথায়?'

'ডানলপের কাছে।' মহিলা হাসল, 'বাড়িটা দোতলা হচ্ছে।'

'দেশে ফিরতে ইচ্ছে করছে না?'

'না। ফিরে গেলে অত টাকা দেব কি করে?'

'বিয়ে করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। চটকলে কাজ করত। কাজ বন্ধ হওয়ায় আত্মহত্যা করেছিল।'

'এই জীবন ভাল লাগছে?'

'কলকাতার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে তো ভাল।'

'কি নাম?'

হেসে উঠল সে, 'আমি যে নামই বলব তাই তো বিশ্বাস করতে হবে। আমার এখনকার নাম মমতাজ।'

এই সময় সেই লোকটি এল, 'পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে।'

মমতাজ আমার দিকে তাকাল। তার পর দ্রুত ভিতরে চলে গেল।

লোকটাকে দুশো ফ্রাঁ দিতে হয়েছিল। সে হেসে বলেছিল, 'তুমি তো অদ্ভুত লোক, ওর নাচ দেখলে না, জামা খুলতে বললে না। অথচ জানো দুশো ফ্রাঁ দিতে হবে তোমাকে, তবু শুধু কথাই বলে গেলে!'

জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনি।

আসলে জবাব দেওয়ার কিছুই ছিল না।

সেই তিরিশ থেকে সত্তর সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যাঁরা লেখালেখি করতেন, তাঁদের প্রতিভার সঙ্গে আমাদের কোনও তুলনা চলে না। অন্তত আমার তো নয়ই। সেই সব মানুষরা জটিল জীবন-যাপন করতেন না। পাঠকেরা কোনও অনুষ্ঠানে ডাকলে চেষ্টা করতেন উপস্থিত হতে। সাধারণত পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন শহর, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ আর অসমের গৌহাটিতে প্রায়ই তাঁদের ডাক পড়ত। এই নিয়ে অনেক মজার গল্প চালু আছে। সমাদর করে নিয়ে গিয়ে প্রচুর খাওয়াতো, সভায় অনেক লোক হল কিন্তু ফেরার সময় কোনও উদ্যোক্তার দেখা নেই। পকেটের টাকা খরচ করে টিকিট কেটে ফিরতে হত।

এক বিখ্যাত লেখক তো যাওয়ার আগেই ফেরার টিকিটটা দিয়ে যেতে বলতেন। এইরকম যাওয়া আমার পছন্দের নয়। একই কথা সব জায়গায় বলতে হয়। পছন্দ না হলেও হাসিমুখে দাঁড়াতে হয়। নেমন্তন্ন এলে আমি এড়িয়ে যেতে চাই। তারপরেও ধরাধরি করলে যেতে হয়। এ রকম চাপে পড়ে একবার দুর্গাপুর আসি ট্রেনে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ট্রেনের বসার আসনে সহযাত্রী যিনি তাঁকে চিনি না কিন্তু হাওড়া ছাড়ার পর থেকেই তাঁর গুনগুনানি শুনতে পাচ্ছি। আলাপ হল, 'এই একটু দুর্গাপুর যাচ্ছি দাদা।'

'ওখানে থাকেন?'

'না-না। ফাংশন আছে...

'ও।'

'একজনের মাধ্যমে ধরেছে। আট হাজারেই রাজি হতে হল।'

'কী গান গান?'

'রবিঠাকুরের গান। আমি স্বপ্নময় মিত্র।'

'ও।'

'কবে ফাংশন?'

সে যে ফাংশনের নাম বলল সেখানকার উদ্যোক্তারাই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। মঞ্চে উঠলে আমাকে ফুলের মালা, এক প্যাকেট মিষ্টি আর পঞ্চাশ টাকার কলম দেবে। তাই নিয়ে দুটো দিন নষ্ট করতে হবে আমাকে। আর আমার পাশে বসা ছোকরা, যার নাম আমি এখনও গায়ক হিসাবে শুনিনি, আট হাজার পকেটে ঢোকাবে। খুব অপমানিত হয়েছিলাম। বর্ধমান এলে টুক করে নেমে লোক্যাল ট্রেন ধরে ফিরে গিয়েছিলাম হাওড়ায়।

কিন্তু ভুবনেশ্বরের আমন্ত্রণ অনেক চেষ্টাতেও ফেরাতে পারিনি। স্টেশনে উদ্যোক্তারা ছিলেন। আমি বলে রেখেছিলাম হোটেলে উঠব। তাঁরা অনুনয় করতে লাগলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী জগন্নাথ ঘোষ বারবার বলেছেন তাঁর গেস্ট হাউসে আমাকে নিয়ে যেতে। ফাইভস্টার হোটেলের ব্যবস্থা। কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না।

অতএব যেতে হল।

বিশাল বাড়ি। বাঁধানো চাতালে কয়েকটা গাড়ি। আমি নামতেই শাঁখ বেজে উঠল। সেই সঙ্গে উলুধ্বনি। এ সব ভেসে আসছে ভিতর থেকে। দোতলা বাড়ি। বাড়ির লাগোয়া গেস্ট হাউস। সেখানে গিয়ে বুঝলাম ফাইভ স্টার না হোক, ঘরটিতে বিলাসদ্রব্যের প্রাচুর্য আছে। সকালে পৌঁছেছিলাম। লম্বা, মোটা, গলায় সোনার চেন-পরা জগন্নাথবাবু এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন, 'আমি ধন্য, আপনি এসেছেন বলে। ওঃ, আপনার 'বিবর' পড়েছিলাম, কী সেক্সি লেখা!'

' 'বিবর' আমার লেখা নয়, সমরেশ বসুর।'

'তাই?'

'তিনি গত হয়েছেন।'

'তা হোন। পদবীতে কি এসে যায়, আপনি তো আছেন। এখন বলুন, কি সেবা করবেন? চিকেন, মাটন, ল্যাম্ব তিনটেই আনিয়েছি। মাছের মধ্যে পাঁচ রকম আছে।' ঘোষমশাই নিবেদন করলেন।

'আমি খুব কম খাই। যে কোনও একটা দিলেই চলবে।'

'আর একটা কথা—।'

'বলুন?'

'লেখকদের তো একটু প্রয়োজন হয়। সকালে কি দেব? বিয়ার? ভদকা? জিন? ডাবের জলের সঙ্গে ভদকা ভাল লাগবে।'

'আমি দিনের বেলায় ও সব কিছুই খাই না।'

'অ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, রাত্রে দেখা যাবে। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে বসুন, চিংড়ির কাটলেট, মাটন কাবাব আসছে, তাই দিয়ে কষ্ট করে জল-খাবার—, হেঁ হেঁ।' ঘোষমশাই বিদায় নিলেন।

বাথরুম থেকে বেরুতেই দরজায় শব্দ হল। বললাম, 'আসুন।'

দরজা ঠেলে চারজন মহিলা ঘরে ঢুকলেন। সামনে যিনি তিনি শীর্ণা, মধ্যবয়স্কা, কপালে রসকলি, পরনে গরদ।

হাত জোড় করে বললেন, 'অতিথি নারায়ণ। নারায়ণের দর্শন করতে এলাম। হরেকৃষ্ণ। কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না, না।' অনুষ্ঠানে বুঝলাম ইনি জগন্নাথবাবুর স্ত্রী।

'এই ঘরের সবই ম্লেচ্ছ। বীণা, গঙ্গাজল তিনফোঁটা ছড়িয়ে দে।'

একজন মহিলা গোলাকার পাত্র থেকে কয়েক ফোঁটা জল চারপাশে ছড়ালেন। জগন্নাথবাবুর স্ত্রী বললেন, 'এইবার একটু সেবা করতে হবে।'

'সেবা?' হকচকিয়ে গেলাম।

'নারায়ণের ভোগ। সেই ভোর সাড়ে তিনটে থেকে নামগান, পুজো হয়। একটু আগে নারায়ণ ভোগ সারলেন, আমার দিন কাটে ওঁর সঙ্গে। এই টেবিলে সাজিয়ে দে।'

আদেশ পাওয়ামাত্র বাইরে থেকে ট্রেতে চাপানো ডিস আসতে লাগল। পায়েস, নানান রকমের ফল, ছানা, মিষ্টি, ফুলকো লুচি, আলুর সাদা তরকারি, সরবৎ।

'ওকি?' চেঁচিয়ে উঠলাম।

'সামান্যই। দুপুরের ভোগ খেয়ে নারায়ণ তৃপ্তি পাবেন। ঠিক আছে, আপনি সেবা করুন। বিকেলে একবার বিগ্রহ দর্শনে যাবেন।' ওঁরা চলে গেলেন। টেবিলের দিকে তাকালাম। যে পরিমাণে খাবার দিয়েছেন, তা গোটা দিনের পক্ষেও বেশি।

চুল আঁচড়ে খেতে বসব ভাবছি হঠাৎ জগন্নাথবাবুর উদয়।

'একি! এই সব রাবিশ এখানে কেন? হরি, হরি।'

একটি কাজের লোক ছুটে এল। জগন্নাথবাবু বললেন, 'প্যাক করো, প্যাক করো, জলদি।'

লোকটি প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে সব ঢুকিয়ে নিল। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় কাজের লোক ঢুকল ঘরে। টেবিলে সাজিয়ে দিল পরোটা, কাবাব। চিংড়ির কাটলেট। জগন্নাথ বললেন, 'শুরু করুন, চা আসছে।'

গোটা দিন ধরে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধারার জোয়ারে ভেসেছি আমি। একই পরিবারে দুই ধারা। এটা ভারতবর্ষ বলেই সম্ভব।

ভেবেছিলাম এই কাহিনি কখনও লিখব না। এ জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে যা লিখলে কিছু মানুষকে তীব্র অস্বস্তিতে ফেলা হবে। সেদিন এক বন্ধু বললেন, যার অস্বস্তি হবে, তার নাম বদলে দিন, আমরা কেন অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হব! ভাবলাম। অনেকটা সময় বয়ে গিয়েছে। সত্যপাও আমাদের মধ্যে নেই। লেখাই যাক।

নবীন পাঠকরা হয়ত জানেন না, আমার লেখক হওয়ার কথা ছিল না। শুরু করেছিলাম নাটক করব বলে। দলও তৈরি হয়েছিল। বিমল করের উপন্যাস পিয়ারিলাল বার্জকে নাট্যরূপ দিয়ে কয়েকটি শো করেছিলাম। নাম ভূমিকায় আমি, পরিচালক হরেন মল্লিক। বন্ধু সুব্রত ভট্টাচার্য দলের স্তম্ভ ছিল কারণ, একমাত্র সে-ই চাকরি করত। এখানকার বিখ্যাত নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত দলের কনিষ্ঠ সদস্য ছিল। কিন্তু মন ভরছিল না। মৌলিক নাটক ছাড়া দলের পরিচিতি তৈরি হয় না।

ছুটলাম মনোজ মিত্র এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। আমাদের মত উটকো দলকে তাঁরা নতুন নাটক দেবেন কেন? শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে কলেজ স্কোয়ারে বসে আছি। সুব্রত বলল, তুই তো খুব বই-টই পড়িস, তুই লেখ না নাটক।

উত্তেজিত হয়ে লিখে ফেললাম। দলে পড়াও হল। কেউ কিছু বলার আগেই বলে ফেললাম, 'দূর এটা নাটকই হয়নি।'

সুব্রত পরামর্শ দিল, 'আগে গল্পটা ভাব, গল্পের মত লিখে ফ্যাল, তার পর নাট্যরূপ দে।' তাই করলাম।

গল্পটা পড়া হলে সুব্রত বলল, 'দারুণ হয়েছে গুরু, দেশ পত্রিকায় পাঠিয়ে দে।'

দিলাম। ছাপাও হল। আমার নাট্যকার হওয়ার বদলে গল্পকারের জীবন শুরু হয়ে গেল। তার পর আর নাটক লিখিনি।

বছর সাতেক আগে আমেরিকার কিছু বাঙালি বন্ধু প্রস্তাব দিলেন ওদের ওখানে নাটক নিয়ে যেতে। দুলাল, দুলাল লাহিড়ীকে বলতে সে রাজি হয়ে গেল। সে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গেল। উত্তম মঞ্চের অফিসে বসে সত্যদা বললেন, 'আমরা নহবৎ নিয়ে এককালে গিয়েছিলাম। ঠিক হয়নি। চল, আর একবার যাই। কিন্তু কি নাটক নিয়ে যাবে?'

দুলাল বলল, 'ওরা বলেছে সাতজনের দল নিয়ে যেতে।'

'তার মানে সাতটি চরিত্র। সমরেশ, তুমি লেখো নাটক। সিরিও কমেডি।'

আমি আঁতকে উঠলাম, 'অসম্ভব, আমার দ্বারা হবে না। নাটক লেখা খুব কঠিন।'

'তুমি পারবে!' সত্যদা মাথা নাড়লেন।

আমি তখন তাঁকে তরুণ বয়সের কাহিনি শোনালাম।

'তার পরে তিরিশ বছর চলে গিয়েছে, যে অত মোটা মোটা উপন্যাস লিখতে পারে সে অবশ্যই পারবে। লেখা হয়ে গেলে ফোন করবে।' সত্যদা রায় দিলেন।

গোদের ওপর বিষফোঁড়া হল দুলাল। বলল, 'আপনি সেই তেরো পার্বন থেকে চিত্রনাট্য লিখে যাচ্ছেন, মঞ্চের জন্য লিখতে পারবেন না? আমরা এমন একটা নাটক নিয়ে ওখানে যাব যা ওরা আগে দ্যাখেনি।'

গ্যাস খেয়ে গেলাম। তিনদিন লিখে যে নাটক তৈরি হল, সেটি পড়ার পর সবাই খুব খুশি। সত্যদা বলল, 'তুমি ছাড়া কেউ এটা লিখতে পারত না।' গ্যাস কাকে বলে।

নাটকের ঠাকুর্দা সত্যপ্রকাশ সাজবেন সত্যদা, তাঁর ছেলে দুলাল লাহিড়ী,

তৃতীয় পুরুষ চরিত্র হল কাঞ্চন, যে কি না নায়ক। অনেক নাম ভাবা হল। শেষ পর্যন্ত দুলাল রঞ্জিত মল্লিকের নাম প্রস্তাব করল। রঞ্জিত আমার খুব ভাল বন্ধু। এ রকম ভদ্র মানুষ আমি পঞ্চমজন দেখিনি। কিন্তু সেটাই সব নয়। রঞ্জিতের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছে। অথচ কাঞ্চনের বয়স আঠাশ। ওই চরিত্রে ওকে মানায় না। দুলাল জানাল, শিশির ভাদুড়ি তাঁর অর্ধেক বয়সের চরিত্রে দারুণ অভিনয় করতেন। শম্ভু মিত্র মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ঘরে বাইরের অতীন করেছেন। রঞ্জিত পারবে না কেন? তা ছাড়া ওকে আমেরিকার বাঙালিরা সবাই জানে। একমাত্র সমস্যা, ও এত ব্যস্ত অভিনেতা যে, দুমাস নাটকের জন্যে দিতে পারবে কি না সেটাই সমস্যা।

রঞ্জিতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ওর 'শত্রু' ছবি মুক্তি পাওয়ার পর। 'ইন্টারভিউ' থেকে অনেক ছবিতে অভিনয় করলেও 'শত্রু' হই-চই ফেলে দিয়েছিল। এ দেশে ও রকম সুপারহিট কোনও ছবি করলে তার নায়কের চালচলন বদলে যায়। কিন্তু ভবানীপুরের মল্লিকবাড়ির অভিজাত বংশের ছেলে রঞ্জিতের ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন এল না। এই এখন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে সবচেয়ে প্রিয় শিল্পীর নাম রঞ্জিত মল্লিক। ওর ব্যবহারে কে সেটা বুঝবে। তা রঞ্জিত আমাকে ফোন করল, 'সমরেশবাবু, দারুণ লাগল। আমি করব।'

রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। বেশির ভাগই রঞ্জিতের বাড়ির তিনতলায় রিহার্সাল হত। ওর স্ত্রী দীপা, খুব মিষ্টি মেয়ে। রোজ দারুণ খাওয়াতো আমাদের। সত্যদাও মাঝেমধ্যে খাবার আনতেন। নায়িকা চরিত্রে গ্রুপ থিয়েটারের ভাল অভিনেত্রীকে নেওয়া হল। নায়িকার মা করেছিলেন শকুন্তলা বড়ুয়া।

আমেরিকার বাল্টিমোর শহরের পি কে ঘোষ ছিলেন উদ্যোক্তা। যাত্রার তিনদিন আগে তিনি জানালেন দুমাসে পনেরটি শহরে অভিনয় করতে হবে আমাদের। নাটকে একটি উকিলের চরিত্র ছিল। দুই অর্ধে দুবার ঢুকবে সে খুব, খবর দে যা নাটকটায় মোচড় আনবে। কে করবে ওই ছোট্ট চরিত্র? সত্যদা বললেন, 'সমরেশ।'

সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিত-এর দুলাল গলা মেলালো, বাধ্য হলাম রিহার্সাল দিতে। চর্চা না থাকায় নিজের লেখা সংলাপ নিজেই মনে করতে পারছি না। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। রওনা হওয়ার আগে উত্তম মঞ্চে একটা ঘরোয়া শো হল। দেখলাম, খুব হাততালি পড়ল।

যাত্রার দুদিন আগে কাগজে দেখলাম নায়িকার বাবা মারা গিয়েছেন। মাথায়

বাজ পড়ল। এই অবস্থায় নিশ্চয়ই ওঁকে যেতে বলা যায় না। দুলাল, সত্যদা, রঞ্জিতও চিন্তিত। এত কম সময়ে কাউকে তৈরি করার চেষ্টা করে লাভ নেই। ভিসা পাবে না। তা হলে কি হবে? ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ, নায়িকা জানালেন, শোক যত তীব্র হোক, তিনি যাবেন।

তার পর এক সন্ধ্যায় আমরা নেতাজি সুভাষ এয়ারপোর্টে মিলিত হলাম। কলকাতা থেকে দিল্লি। সেখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে গিয়ে আমেরিকা। রঞ্জিত ওঁর স্ত্রী-কন্যাকে সঙ্গে নিয়েছিল নিজের খরচে। সত্যদা তাঁর বয়সের কারণে পুত্রবধূকে নিয়ে যাচ্ছেন খরচ দিয়ে। সবই হল। শুধু শকুন্তলা বড়ুয়ার দেখা নেই। প্লেন ছাড়ার সময় হল। আমরা সবাই প্লেনে উঠে বসেছি, আর ভাবছি যে কোনও মুহূর্তে শকুন্তলা আসবেন। কিন্তু এলেন না। প্লেন ছাড়ল। আমি মনে মনে প্রবাসী আমেরিকান বাঙালিদের মধ্যে ওই বয়সী মহিলাকে খুঁজছি, যিনি একটু আধটু নাটক করেন। একজনের কথা মনে এল। গিয়ে তাঁকে রাজি করিয়ে তৈরি করার ভার দুলালের ওপর। এই সময় একজন প্লেন-কর্মচারী এসে জানালেন, 'মিসেস বড়ুয়া এইমাত্র এয়ারপোর্টে পৌঁছেছেন। তিনি শেষ ফ্লাইটে দিল্লি আসছেন।'

আমরা প্লেনের সিটে বসে অঙ্ক কষলাম। শেষ ফ্লাইট দিল্লিতে পৌঁছবে রাত সাড়ে এগারোটায়। তারপর ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট থেকে ইন্টারন্যাশনালে যেতে হবে। ব্যাগেজ সংগ্রহ করে সেখানে পৌঁছতে রাত সাড়ে বারোটা বেজে যাবে। দেড়টায় ফ্লাইট। একা একজন মহিলার পক্ষে একটু কঠিন ব্যাপার।

অনেকক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকার পর শেষপর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিমানে উঠে বসলাম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে প্লেন ছাড়বে। শকুন্তলার দেখা নেই। অর্থাৎ সে এসে পৌঁছতে পারেনি, চিন্তা হচ্ছিল। দিল্লিতে সে যদি চলে আসে, তা হলে আজ রাত্রে কোথায় থাকবে? নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল, কিন্তু প্লেন ছাড়ছে না। প্রায় মিনিট দশেক কেটে যাওয়ার পর আমরা শকুন্তলাকে দেখতে পেলাম। উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে আসছে যাত্রীদের মাঝখানের প্যাসেজ দিয়ে। ওকে সিটে বসাবার পরও থরথর করে কেঁপে যাচ্ছিল।

সত্যদা বললেন, 'কেউ কথা বলো না, শান্ত হওয়ার সময় দাও।'

মিনিট কুড়ি পরে সে স্থির হল। জানাল, তার দুর্ভাগ্যের জন্য স্বামী ভদ্রলোকটি দায়ী। তিনি বলেছিলেন, দিল্লির ফ্লাইট রাত আটটায় দমদম থেকে ছাড়ে। [illegible] বেলায় এয়ারপোর্টে এসে শোনেন প্লেন টেক অফ করেছে।

আর কিছু করার নেই বলে সবাই তাকে বাড়ি ফিরতে বললেও সে রাজি না হয়ে শেষ ফ্লাইট ধরেছে। দিল্লির ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টে নেমে টেলিফোনে এই এয়ারলাইন্সকে অনুরোধ করেছে, যাতে তার জন্যে অপেক্ষা করে।

সত্যদা বললেন, 'অতীত ভুলে যাও, ভবিষ্যতের দিকে তাকাও। এখন আমাদের নাটক-পরিবার একত্রিত।' তারপরই নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও সমরেশ, এরা মাল দেবে না খেতে?'

'আপনি খান?'

'তাতে তোমার কি দরকার, দেবে কি না বল?'

'প্লেন আকাশে উড়লে দেবে। কিন্তু এখন মধ্যরাত।'

উনি বললেন, 'অন্ধের কিবা দিন, কিবা রাত।'

বিমান বালিকারা যখন ট্রলি নিয়ে এল, তখন দেখলাম সবাই হুইস্কি, ওয়াইন, বিয়ার অথবা অরেঞ্জ জুস নিচ্ছে। এক পেগের মিনি শিশিতে হুইস্কি দিচ্ছে মুখ খুলে। সত্যদা বললেন, 'এটা কি হল? মুখ বন্ধ থাকলে বুড়োর জন্য নিয়ে যেতাম। এখন তো সব পড়ে যাবে। নাও, তোমার সেবায় লাগুক।'

'এত রাতে একটার বেশি খাব না দাদা।'

'ও। ও রঞ্জিত, আমারটা নেবে নাকি?'

রঞ্জিত হাসতে হাসতে হাত নেড়ে না বলল।

সত্যদা গুণগুণ করলেন, 'আমি স্কচ নিয়ে বসে আছি আকাশ পারে, কে নিবি তোরা, ওগো তোরা কে!'

এ রকম রসিক মানুষ খুব কম দেখেছি। আমি অভিনয় করতে চাইনি, কিন্তু সত্যদা ভরসা দিয়েছেন, 'আমি তোমার পাশে থাকব। ভুল হলে ঠিক ম্যানেজ করে নেব।' অবশ্য উত্তম মঞ্চের শো-তে ভুল হয়নি, ওঁকে ম্যানেজ করতে হয়নি।

আমরা পৌঁছেছিলাম নেওয়ার্ক এয়ারপোর্টে। নিউজার্সিতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত পি কে ঘোষ। শ্রদ্ধাবান খাটো চেহারার মানুষটির প্রাণশক্তি প্রচুর। যেটা ঠিক করেন, তা থেকে সরেন না। মুখের উপর কথা বলা পছন্দ করেন। ঠিক এই কারণে কেউ কেউ ওঁকে এড়িয়ে যান। আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য মাইক্রোবাস এনেছিলেন পি কে। সেটায় চেপে সোজা চলে গেলাম বাল্টিমোরে।

শহরের বাইরে হাইওয়ের ধারে তাঁর বিশাল বাড়ি। দেখেই চোখ জুড়িয়ে

গেল। বাড়ির ভিতরটা ছবির মত সাজানো। বিশাল হল ঘর। দোতলায় শোওয়ার ঘরগুলি। পি কে অ্যালট করলেন কে কোন ঘরে থাকবে। রঞ্জিতের স্ত্রী-কন্যা পরের দিন তাঁদের আত্মীয়দের বাড়িতে চলে যাবে। ওঁরা আসবেন নিতে।

কোথায় কবে নাটক হবে আমরা জানতাম। একটু তাজা হওয়ার পর কাগজপত্র নিয়ে বসলেন পি কে। ওঁর স্ত্রী খুবই অতিথিবৎসল। দুজনের চেহারায় মিল চোখে পড়ার মত। পি কে গলা তুলে তাঁকে ডাকেন, 'মাঞ্জু' বলে। সত্যদা ডাকলেন 'মঞ্জু মা'। মুহূর্তেই তিনি এ বাড়ির পিতা বা শ্বশুর হয়ে গেলেন।

আমেরিকার বাঙালিরা সোম থেকে শুক্র প্রচণ্ড সময়াভাবে ভোগে। তাই নাটক হয় শনি এবং রবিবার। আমরা শুরু করব ফিলাডেলফিয়া থেকে। তারপরে ওয়াশিংটন। এ দুটো জায়গায় যাওয়া-আসা করা যাবে এই বাড়ি থেকে। এর পরে ওহাইও, বস্টন, শিকাগো, নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলস, সানফ্রানসিসকো, ডালাস, নিউ জার্সি, পিটসবার্গ শহরগুলোয় যেতে হবে বিমানে। কোথায় রাত্রে শো করে ভোর চারটেয় ছুটতে হবে এয়ারপোর্টে প্লেন ধরতে। সোম থেকে শুক্র আমাদের বিশ্রাম। প্রায় দুমাস এই রকমভাবে সমস্ত আমেরিকায় চক্কর দিয়ে দেশে ফেরার সময় লন্ডনে শেষ শো। আমি ঠিক করলাম মঙ্গল থেকে শুক্র বাড়িতে বসে সকালটায় লিখে কাটাব। রঞ্জিত বলল, 'আমি তো দুমাস কাজ বন্ধ করে এলাম, আমার অসুবিধে হচ্ছে না।'

কথাটা ঠিকই। একজন লেখক পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় গিয়ে নিজের ভাষায় লিখে যেতে পারেন, যা একজন অভিনেতার পক্ষে সম্ভব নয়। এই দুমাস কলকাতায় না থাকার জন্যে রঞ্জিত বা সত্যদার যে ক্ষতি হবে, তা তাঁদের প্রযোজকদের হবে। কিন্তু শুধু নাটক ভালবেসে চলে এসেছেন ওঁরা। আমাকে তেমন কোনও ত্যাগ করতে হয়নি।

সকালে পি কে এবং মঞ্জু চলে যান চাকরি করতে। আমাদের খাবারের সব ব্যবস্থা করে দায়িত্ব দিয়ে যান শকুন্তলাকে। সারাদিনে কখনও রিহার্সাল, কখনও আড্ডা। আড্ডার সময় কথাবার্তাতেও নাটকের সংলাপ এসে যাচ্ছে। বিকেলে পি কে ফিরে এসে আমাদের নিয়ে বেড়াতে গেলেন। বাল্টিমোরের সমুদ্রের ধারটি চমৎকার। ছোট বড় প্রচুর নৌকো, ট্রলার জলে ভাসছে। সত্যদা হাঁটছিলেন আগে। ডানদিকে সমুদ্রে নৌকা ভাসছে। হঠাৎ তিনি হাঁক দিলেন, 'কেউ দুমিনিট ডানদিকে না তাকিয়ে হাঁটবে।'

রঞ্জিত জিজ্ঞাসা করল, 'কেন সত্যদা?'

'ওরা একটু ইন্টুমিন্টু করছে তো, ডিস্টার্ব করো না।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই ডানদিকে তাকিয়ে দেখল নোঙর করা নৌকোর খোলে দুটি শরীর পৃথিবী ভুলে চুমু খেয়ে যাচ্ছে পরস্পরকে। দীপা মুখ ফিরিয়ে পায়েলকে উল্টোদিকের আলোকসজ্জা দেখাল, 'ওই দ্যাখ, কি সুন্দর আলো!'

কিন্তু এই যে পিকনিক-পিকনিক ব্যাপারটা, দুদিন পরেই একঘেয়েমিতে পৌঁছে গেল। আজ শুক্রবার। শো আগামীকাল বিকেলে। গোটা দিন কাঁহাতক বাড়িতে আড্ডা মেরে কাটানো যায়! সত্যদা এক সকালে বললেন, 'যাই বেড়িয়ে আসি।'

দুলাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাবেন?'

'এই একটু সমুদ্রের ধারে।'

'সে তো অনেক দূরে।'

'হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাব। আরে আমি গ্রামের ছেলে, হাঁটতে ভয় পাই না।'

সত্যদা ফিরে এলেন কুড়ি মিনিটের মধ্যে। মুখ লাল। কি ব্যাপার। পি কে-র বাড়ি থেকে মিনিট ছয়েক হাঁটতেই হাইওয়ে। নিধুবাবুর টপ্পা গাইতে গাইতে সত্যদা হাইওয়েতে পৌঁছে দেখলেন, ছুটন্ত গাড়ির মিছিল। কিন্তু হাইওয়ের পাশে পায়ে চলার কোনও ফুটপাত নেই। খোলা জমিতে পা রাখলেন তিনি। গান বদলালেন, 'ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি।' মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই সাইরেন বাজিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি হাজির তাঁর পাশে। ড্রাইভারই পুলিশ। সে রিভলভার হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যে প্রশ্ন করল তার বিন্দুমাত্র বুঝতে পারলেন না সত্যদা উচ্চারণের জন্য। রিভলভারটা তাঁকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল যে তিনি ইংরাজিতে বললেন, 'আমি কি অন্যায় করেছি তা যদি দয়া করে বলেন।'

লোকটি চিৎকার করে যা বলল তাও বোধগম্য হল না তাঁর। তখন মরীয়া হয়ে বাংলায় কথা বললেন তিনি, 'উল্লুকের মত চেঁচাচ্ছ কেন? ইংরেজিটা ইংরেজদের মত বলতে শেখোনি?'

লোকটি এই ভাষা শুনে অবাক হয়ে গেল। সেটা বুঝতে পেরে সত্যদা সমানে বাংলা বলে যেতে লাগলেন। শেষে স্টক শেষ হয়ে গেলে গেয়ে উঠলেন, 'আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ, কাণ্ডারি বল ডুবিছে মানুষ সন্তান

মোর মার'। বলা শেষ করে তিনি উল্টোদিকে হেঁটে চলে এলেন যেখান থেকে হাঁটা শুরু করেছিলেন। পুলিশটি অবাক হয়ে তাঁকে দেখে যাচ্ছিল। চোখাচোখি হতে ইশারা করল ফিরে যেতে। সত্যদা আর অপেক্ষা করেননি। বললেন, 'যে দেশে মানুষের অধিকার নেই রাস্তায় হাঁটার, সে দেশে আমি থাকব না। বাড়ি যাব।'

দুলালের সন্দেহ হয়েছিল গল্পটা বানানো। একা বেশিদূর যেতে ইচ্ছে হয়নি, তাই বানিয়েছেন। হাইওয়ের পাশ দিয়ে হাঁটা যে নিষেধ, তা সত্যদারও জানা ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছে হয়েছিল বিশ্বাস করতে।

সেই মাইক্রো বাসে চেপে বাল্টিমোর থেকে গেলাম ফিলাডেলফিয়ায়। পি কে আমেরিকার জনযুদ্ধ সম্পর্কে ভাষণ দিল যেতে যেতে। ফিলাডেলফিয়ায় অতীতে কি কি হয়েছিল তার বৃত্তান্ত। আমাদের সঙ্গে কোনও টেকনিশিয়ান নেই। সেট তৈরি থেকে আলোর ব্যবস্থা সবই নিজেদের করতে হবে। দুলাল তা নিয়ে খুব চিন্তিত। পি কে-র ভরসা মত স্থানীয় কিছু বাঙালি ছেলে সাহায্যের হাত বাড়াল। প্রেক্ষাগৃহটি বেশ বড় কিন্তু সেখানে বক্তৃতা হয়। নাটক হয় না। ফলে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলাম। তার ওপর আলো যাদের অধিকারে সেই সব আমেরিকানদের ঠিক কি চাই তা বোঝাতে গলদঘর্ম হচ্ছিলাম। এদের সঙ্গে রিহার্সাল না দিয়ে নাটক করা ঠিক হবে না বুঝতে পেরেও কিছু করার নেই। দর্শকরা এসে গিয়েছেন।

অনেকক্ষণ পি কে-কে দেখিনি। এবার দেখে চমৎকৃত। প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত চমকদার পাঞ্জাবি পরেছেন। খাটো শরীর প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল পাঞ্জাবিতে। জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'শর্বরী দত্তের কাছ থেকে কেনা। দেশে গেলে নিয়ে আসি দু-তিনটি, এটার দাম তিন হাজার। কমই।'

পর্দা সরলে পি কে মাইকে ঘোষণা করলেন, ফিলাডেলফিয়া থেকে আমাদের

নাট্যযাত্রা শুরু হচ্ছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর নাটক শুরু হল।

রিহার্সালেই আমরা জানতাম কোথায় কোথায় দর্শকরা হাততালি দেবেন, কোথায় কি রকম আওয়াজ উঠতে পারে। রঞ্জিত এবং সত্যদা নিজেদের মধ্যে কয়েকটি কম্পোজিশন তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেগুলি দেখে দর্শকরা খুব খুশি হবেই। মেকআপ নেওয়ার পর অবাক হয়ে দেখলাম রঞ্জিতের বয়স কুড়ি বছর কমে গিয়েছে। মঞ্চে যখন অভিনয় করল, দূর থেকে ওঁর বয়স বোঝা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রথমার্ধের শেষে আমি মঞ্চে ঢুকব। নিজেকে সহজ রাখার চেষ্টা করছিলাম। প্রচণ্ড পেশাদার অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করতে হবে বলে যে একটু নার্ভাসবোধ করছিলাম না তা নয়। বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করব, প্রতিমাদেবী এই বাড়িতে থাকেন কি না। দুলাল বলবে, কে আপনি ভিতরে আসুন। আমি ঢুকব।

ঢুকলাম। ঢোকামাত্র সত্যদার চাপা গলা কানে এল, 'এ্যাই মেরেছে!' এ রকম সংলাপ নাটকে ছিল না। অবশ্য ওঁর গলার স্বর দর্শকরা শুনতেও পাননি। গা শিরশির করে উঠল। হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কিছু বললেন?'

'এ্যাঁ! না ভাই, আমি আর কি বলব! আমার কি বলার বয়স আছে?'

দুলাল তাড়াতাড়ি নাটকের সংলাপে চলে যাওয়ায় আমি বেঁচে গেলাম।

বিরতির সময়ে আমি সত্যদাকে বলতে যেতেই তিনি হাসলেন, 'আগুনে না পুড়লে সোনা পাকা হয় না। তুই পরীক্ষায় পাস।'

'আশ্চর্য! আপনি বলেছিলেন আমাকে সাহায্য করবেন, তার বদলে—!'

'যদি দেখতাম পড়ে যাচ্ছ তা হলে তুলে ধরতাম।'

'দাদা, প্লিজ, আর ও রকম করবেন না।'

'তথাস্তু।'

না। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমাকে বিপাকে ফেলেননি। পরে ওঁর কাছে গল্প শুনেছি। কত বিখ্যাত অভিনেতাকে পার্শ্ব অভিনেতারা মঞ্চে বেকায়দায় ফেলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার ছিলেন এ-ব্যাপারে খুব দক্ষ।

সত্যদার সঙ্গে দুমাস ছিলাম। বাংলা থিয়েটারের নেপথ্য জগতের অনেক কাহিনি ওঁর মুখে শুনেছি। ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, উত্তমকুমার থেকে শুরু করে অনেকেরই। হ্যাঁ। কবিতা লিখতেন সত্যদা, একটু প্রাচীনধর্মী কিন্তু বক্তব্য থাকত।

নাটক জমে গিয়েছিল। একজন মহিলা বিয়ের পঁচিশ বছর পরে স্বামী, কন্যা, শ্বশুরকে একনিষ্ঠভাবে সেবা-যত্ন করার পর আচমকা জানতে পারেন, একজন অচেনা পুরুষ মৃত্যুর আগে তাঁর জন্য এক কোটি টাকা রেখে গিয়েছেন। যাঁকে তিনি চেনেন না, জানেন না, তিনি কেন এত টাকা রাখবেন সেই প্রশ্ন যখন স্বামী, শ্বশুর, কন্যার মনে সন্দেহের ফণা তুলল তখন মহিলার অস্তিত্ব বিপন্ন হল। নাটকের শেষে গ্রীনরুমে এসে মহিলা দর্শকরা বলতেন, 'ভাবতে পারছি না। আমার ক্ষেত্রে যদি এ রকম হত, তা হলে তো একই প্রতিক্রিয়া দেখতে পেতাম।'

আমেরিকার একটি শহরে কোনও কিছু ভুল বা মন্দ ঘটলে আধঘণ্টার মধ্যে সারা দেশের বাঙালিরা জেনে নেয়। মনে আছে প্রথম যেবার আমেরিকায় এসেছিলাম, মনোজের বাড়িতে ছিলাম, নিউজার্সিতে।

সেটা কুড়ি বছর আগের কথা। এক শনিবার রাতের খাবারের নেমন্তন্ন ছিল তিরিশ মাইল দূরের এক পশ্চিমবঙ্গীয় ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে। সন্ধের মুখে পৌঁছনোর পর দেখলাম জনা বারো অতিথি এসেছেন। পরিচয় হল। গৃহকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবেন বলুন, হুইস্কি?' মনোজ গাড়ি চালাবে। হুইস্কি খেয়ে গাড়ি চালানো অপরাধ। সে অরেঞ্জ নিল। আমাকে আধ পেগের কম হুইস্কিতে বরফ ঠেসে দেওয়া হল। সেটায় দু-চুমুক দিয়েছি, তখনও বরফ গলেনি।

গৃহকর্ত্রী সহাস্যে ঘোষণা করলেন, 'ডিনার টেবিলে দেওয়া হয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটলেন ভিতরের ঘরে।

মনোজ বলল, 'আপনি শেষ করুন। আধপেগ হুইস্কি খাওয়ার চেয়ে না খাওয়াই ভাল। আমি গৃহকর্তাকে আবার দিতে বললে তিনি দ্বিতীয়বার আধপেগ দিলেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, এখনই না গেলে ডিনারের সব খাবার ফুরিয়ে যাবে। অতএব মাত্র এক পেগ খেয়ে ভাত গিলতে হল। তার পর তিরিশ মাইল গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে মনোজ যখন হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছে তখন ওর স্ত্রী অবাক গলায় আমায় বললেন, 'সমরেশদা, আপনি নাকি প্রচুর মদ খান?'

'আমি?'

'আমার এক বন্ধু একটু আগে লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে, তোর বাড়িতে কলকাতা থেকে সমরেশ নামের এক লেখক এসেছে, লোকটা নাকি মাতাল!'

'কি বললে তুমি?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমি বললাম একদম না। সমরেশদা আমার বরের চেয়ে কম খান। তা শুনে ও বলল, কি জানি বাবা। একটু আগে নিউ জার্সি থেকে শোভনা ফোন করে বলল, 'ডিনার সার্ভড হয়েছে অথচ উনি নাকি মদ খেয়েই চলেছেন। লেখকরা শুনেছি মাতাল হয়।'

মনোজ বলেছিল, 'এই হল আমেরিকার বাঙালি। সব গ্রামের পুকুর পাড়ের বিধবা পিসিমা। কালকের মধ্যে বোস্টন থেকে সল্টলেক, টরেন্টো থেকে মায়ামির সব বাঙালি খবরটা আরও সাজিয়ে পেয়ে যাবে।'

এবার নাটকের পর ভাল কথাটাই প্রচারিত হল। পি কে-র কাছে ফোন আসতে লাগল, আমাদের শহরে নাটকটা করতে চাই। পি কে গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিলেন, অল শো বুক্‌ড।

সেবার সত্যি হ্যারিকেন ট্যুর হয়েছিল। একের পর এক শহরে যাচ্ছি। শো করছি কিন্তু শহরটাকে ভাল ভাবে দেখতে পারছি না। একমাত্র কলম্বাস ওহায়িও ছাড়া। বেশির ভাগ এয়ারপোর্টে সে দেখতাম পাঁচ জন কি ছয়জন উদ্যোক্তা হাসিমুখে ফুল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমাদের দলের সবার পরিচয় আগেই পি কে ওঁদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রতিটি শহরে পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের সংগঠন আছে যারা পুজো করে। কোথাও একাধিক। আমরা পৌঁছবার আগে তারা ঠিক করে নিয়েছেন দলের কাকে কাকে নিজের বাড়িতে রাখতে চান। স্বভাবতই গৃহিনীরা চাইবেন রঞ্জিতকে তাঁর বাড়িতে রাখতে। কোথাও কোথাও এ নিয়ে লটারি হত। কেউ কেউ সত্যদাকে চাইতেন। আমাদের কোনও পছন্দ কাজ করত না দেখে রঞ্জিত বলল, 'সমরেশবাবু, এখন থেকে আমি আর আপনি একসঙ্গে থাকব।'

বোস্টনে নেমে দেখলাম, মাত্র দুটো বাড়িতে আমাদের আটজনকে রাখা হবে। সত্যদারা গেলেন এক বাড়িতে, আমি, রঞ্জিত, দুলাল স্বপন রায়ের বাড়িতে।

আমেরিকায় যে কজন স্বজন মানুষের দেখা পেয়েছি, স্বপন তাঁদের একজন। ওঁর স্ত্রীও চমৎকার মানুষ। খুব জমিয়ে ছিলাম আমরা। স্বপন ছুটি নিয়ে শহরটা আমাদের নিয়ে চষে বেড়াত। ওখানে অভিনয় করতে গিয়ে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল। রঞ্জিতকে এতদিন টিপিক্যাল ভদ্রলোক বলে মনে করতাম। দেখলাম, ওর মনেও হালকা রোমান্টিসিজম মাঝে মাঝে ঢেউ তোলে। অবশ্য সেটা ওর অভিনয়ও হতে পারে।

যখন শহর ছাড়তাম, তখন দেখতাম কয়েকদিনেই উদ্যোক্তা বন্ধুদের চোখে জল। মন ভার হয়ে যেত। এঁদের অনেকের সঙ্গে হয়ত কখনওই দেখা হবে না, কিন্তু মনের কোণে থেকে গেলাম, ওঁরাও রয়ে গেলেন।

কলম্বাসে আমাদের রাখা হয়েছিল একটা দামী হোটেলে। এ কারণে তনুশ্রীর খুব রাগ। তনুশ্রী আমার বন্ধু। সেই চুরাশি সাল থেকে এখন পর্যন্ত বার তিনেক তার বাড়িতে থেকেছি। উননব্বই সালে তো দিন পনেরো। ষোল থেকে ফার্স্ট জানুয়ারি যখন ওই শহর বরফে ঢেকে গিয়েছে। মোটেলে ওঠা ওর পছন্দ হয়নি। তনুশ্রীর স্বভাব যা মনে আসে তা মুখে বলে দেয়। সেই সময়টায় চুপ করে থাকলে পরে খাতির জোটে। এই ওহায়িওর একটা বাড়িতে নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে আমি অবাক। গৃহকর্তার বই-এর আলমারিতে আমার গোটা তিরিশেক বই। মনে হচ্ছিল আমার ছেলেমেয়েদের দেখছি। খুব ভাল লেগেছিল।

আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চল অনেকটা শুকনো, ঠাণ্ডা কম। নাভাদা মরুভূমির পাশে বলেই গরমকালে বেশ গরম পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য বলা হয় যে অঞ্চলকে তার মূল শহর লস এঞ্জেলস এবং সানফ্রানসিসকো। লস এঞ্জেলসে আমি এর আগে দুবার গিয়েছি, সানফ্রানসিসকোতে যাওয়া হয়নি। এবার হল। এয়ারপোর্টে নেমে জানলাম আমাদের সবাইকে একই বাড়িতে থাকতে হবে। মনোজিৎ-সীমার

বাড়ি নাকি খুবই বড়। জেনে খুশি হলাম। এই দুজন মানুষ এত ভাল যে আঠারো ঘণ্টার মধ্যে পুরো বাড়িটা আমাদেরই হয়ে গেল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অল্পবয়সী এক ছোকরা রোজ গাড়ি নিয়ে আসত। তার ইচ্ছে আমাদের দলের মেয়েদের শহর ঘুরিয়ে দেখাবে। প্রথমদিন শকুন্তলার ওপর দায়িত্ব দিয়ে ওদের ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু পরের দিন শকুন্তলা যেতে চাইল না। ওরাই গেল।

এতদিন ট্যুর করছি কিন্তু কোনওদিন নিজেদের নিয়ে সমস্যায় পড়িনি। এক সকালে টেলিফোন এল। সামা জানালেন, ইন্ডিয়া থেকে ফোন এসেছে। আমি রিসিভার তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে বলছেন?' যে নামটি বলল সেটি নায়িকার প্রেমিক অথবা সদ্য সই-করা স্বামীর। ছেলেটিকে আমি ভাল চিনি। তাই বললাম, 'কেমন আছ? সমরেশদা বলছি!'

ছেলেটি বলল, 'ও! ওকে দিন।'

আমি অবাক হলাম। এ ভাবে তো কথা বলে না ও আমার সঙ্গে। নায়িকাকে ডেকে রিসিভার ধরিয়ে দিয়ে চলে এলাম বাইরে। সে দশ মিনিট কথা বলল। কথা শেষ করে আমার কাছে এসে হেসে বলল, 'আপনি ফোনটা ধরেছিলেন? ও না ঠিক বুঝতে পারেনি।'

'হতে পারে। হয়ত আমার নামটাই ও শুনতে পায়নি।'

নাটক যেমন ভাল হওয়ার তা হল। কিন্তু তার আগে কানাঘুষো শুরু হয়ে গেল অবিবাহিত ছেলেটি নায়িকার প্রেমে পড়েছে। ছেলেটি ভাল চাকরি করে। স্থানীয় লোকজন খোঁজ-খবর করতে লাগলেন, নায়িকা বিবাহিতা কি না অথবা দেশে কাউকে কথা দিয়ে এসেছেন কি না। সত্যদা বললেন, 'আমরা কিছুই জানি না ভাই।'

ছেলেটি কয়েকদিন ধরে প্রচুর উপহার কিনে এনে দিল। রাত্রে আমাদের শো শেষ হত প্রায় দশটায়। এখানে সূর্য ভোর আটটায়। প্রেক্ষাগৃহ থেকে ডিনারের আমন্ত্রণে ছুটলাম। সেখান থেকে ছাড়া পেলাম রাত একটায়।

ভোর পাঁচটায় ফ্লাইট। এয়ারপোর্ট পৌঁছতে হবে চারটের সময়। যেতে লাগবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। মাত্র সওয়া দু-ঘণ্টার জন্য ঘুমোবার কোনও মানে হয় না। মুশকিল হল সেদিন সকালেই লস এঞ্জেলসে পৌঁছনোর পর সন্ধ্যেবেলায় শো করতে হবে। ঠিক করলাম সারাদিন ঘুমোতে হবে।

সেই শেষ রাত্রে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠছি, তখনও কয়েকজন

উদ্যোক্তার সঙ্গে ছেলেটি হাজির। গাড়িতে ওঠার আগে সে নায়িকাকে একটু আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু বলেছিল। কি বলেছিল জানি না। নায়িকা তার ব্যাগ খুলে পার্স বের করে একটা ছবি দেখিয়ে মাথা নেড়েছিল। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে তাকাল। তখন শুকতারা স্পষ্ট হয়েছে।

সেবার লস এঞ্জেলস শহর চুটিয়ে দেখেছিলাম। ইউনিভার্সাল স্টুডিও, ডিজনিল্যান্ড তো বটেই, খানিক দূরের লস ভেগাসেও নিয়ে গিয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। এই এখানেই অনেক ঢেউ উঠেছিল আমাদের নাটক-পরিবারে। জীবন শিখিয়েছে, ঢেউ যেমন ওঠে তেমনই মিলিয়েও যায়। ধৈর্য হারালেই মুশকিল।

সত্যদা, অভিনেতা, পরিচালক, কবি সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাঝেমাঝেই মনে পড়ে আজকাল। এমন প্রাণবন্ত মানুষটি দেশে ফিরে আসার কিছুকাল পরে আচমকা চলে গেলেন। ওঁর জন্যেই ওই ভ্রমণটিকে কখনওই ভুলতে পারব না।